মাসুদ রানা

ভারত নাট্যম

কাজী আনোয়ার হোসেন



ভারতনাট্যম

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৬৬

এক

৩০ আগস্ট, ১৯৬৫

'এবারে কথক নৃত্য পরিবেশন করছেন শ্রীমতি মিত্রা সেন।'

ঘোষকের মিষ্টি গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গেই গিজগিজে ঠাসা প্রকাণ্ড হলঘরের প্রচণ্ড কোলাহল মৃদু গুঞ্জনে পরিণত হলো। হল কাঁপিয়ে বেজে উঠল তবলার তেহাই।

তিক ধা ধিগি ধিগি থেই। তিক ধা ধিগি ধিগি থেই।

তিক ধা ধিগি ধিগি।

ধা ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা। না তিন তিন না।

তেটে ধিন ধিন ধা।···

এক এক করে সব বাতি নিভে গেল। স্তব্ধ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠল দর্শকবৃন্দ। নিশ্চুপ হয়ে গেল মস্ত হল ঘরটা।

কালো স্ক্রীন সরে যেতেই প্রথমে লাল, পরে হালকা নীল আলো ঝিলমিল করতে থাকল ঢেউ খেলানো সিল্কের সাদা পর্দার ওপর। তারপর সে পর্দাও দু'ফাঁক হয়ে সরে গেল ধীরে ধীরে। দেখা গেল নমস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতার সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা মিশনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, অতুলনীয়া সুন্দরী শ্রীমতি মিত্রা সেন। স্পট লাইটের স্বপ্নিল আলো একটা মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে মিত্রা সেনকে ঘিরে। এক শ্রেণীর দর্শকের মধ্যে থেকে একটা আধা-অশ্লীল উল্লাস-ধ্বনি উঠেই মিলিয়ে গেল।

তা তে থেই তাত। আ তে থেই তাত। থেই আ থেই আ থেই।

থেই থেই তাত তাত থা। তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা আ।

তেরে কেটে গদি গেনে ধা আ। তেরে কেটে গদি ঘেনে।

ধা ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা। না তিন তিন না।

তেটে ধিন ধিন ধা।···

আরম্ভ হলো নাচ। শতকরা নব্বই জন দর্শকই সেই মুহূর্তে মনে মনে স্থির করল, যে করে হোক আগামী দিনের টিকেট যোগাড় করতেই হবে—ব্ল্যাকে দশগুণ দামে হলেও।

হলঘরের অসহ্য ভ্যাপসা গরমে ফটোগ্রাফারের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে বসে বসে ঘামছে মাসুদ রানা। আর মনে মনে পিণ্ডি চটকাচ্ছে ঢাকায় এয়ার-কণ্ডিশনড রুমে সুখে নিদ্রামগ্ন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের। যতসব রদ্দি পচা কাজের ভার বুড়ো বেছে বেছে ওর কাঁধে চাপায়।

কেন? আর লোক নেই? ইণ্ডিয়ার নাম শুনলেই একেবারে যেন বাই চড়ে যায় বুড়োর মাথায়। ডন কুইকজোটের মত খেপে গিয়ে হাওয়ায় তলোয়ার ঘোরাতে আরম্ভ করে দেয় একেবারে।

আরে বাবা, একদল ন্যাকা মেয়েছেলে আর তাদের সঙ্গে মেয়েলী স্বভাবের মিনমিনে কতগুলো ননীর পুতুল এসেছে কলকাতা থেকে গায়ক-গায়িকা-নর্তকী সেজে। এদের মধ্যে তাকে ঢোকাল বুড়ো কোন আক্কেলে? তাও যদি রিপোর্টার বা অন্য কোনও পরিচয়ে হত তো এক কথা। তা নয়। তার কাজ কি—না ফটো খিঁচা। এখন যে গরম লাগছে, তার কি হবে? পচা গরমে ঘামতে ঘামতে হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল রানার। সব রাগ গিয়ে পড়ল রাহাত খানের ওপর। দুই মিনিটের চেষ্টায় অনেক কষ্টে দূর করল রানা মন থেকে সব বিক্ষোভ।

ভাদ্রের প্রায় মাঝামাঝি। শরৎ কাল। কিন্তু এবারের শরৎ যেন গুমোট ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। মায়ের আঁখির মত নীল আকাশ, পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের অক্লেশে হাওয়ায় ভেসে যাওয়া, মাঝে মাঝে উত্তর থেকে অনেক স্মৃতি জাগিয়ে তোলা নীলুয়া বাতাস, সন্ধেবেলায় পুজোর ঘন্টা, শিউলীর জমাট সুগন্ধ, আমেজ—সবই আছে। কিন্তু গরমটা যেন চেপে বসেছে গদির ওপর স্বৈরাচারী শাসকের মত; নড়বে না কিছুতেই।

তার ওপর সিগারেটের ধোঁয়া আর এতগুলো লোকের আড়াই ঘন্টা ধরে অবিরাম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ভারি হয়ে উঠেছে রাজশাহী টাউন হলের বদ্ধ বাতাস। কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়? চোখ দুটো অল্প অল্প জ্বালা করে রানার। সম্মোহিত দর্শকবৃন্দের দিকে একবার নির্লিপ্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

রানার বাঁ কাঁধে ঝুলছে ব্রাউন হবি EL 300 ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ গান এবং বিভিন্ন ফোকাল লেংথের নিকর লেন্স, ফিল্টার; এক্সট্রা লেন্স-হুড; কেব্‌ল্‌-রিলিজ, একটা মোটর ড্রাইভ এবং অন্যান্য হাবিজাবিতে ভর্তি একখানা গ্যাজেট ব্যাগ; আর ডান কাঁধে টু-পয়েন্ট এইট লেন্সের একটা রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা। গলায় ঝুলছে একখানা বিখ্যাত নিকন-এফ ক্যামেরা। লেন্স-হুড লাগানোই আছে তাতে। দ্রুত ফোকাস করবার জন্যে সৃপ্লিট ইমেজ রেঞ্জ ফাইণ্ডার স্ক্রীন ব্যবহার করছে সে আজ।

পাকা ফটোগ্রাফারের বেশে নিজেকে কেমন বিদঘুটে দেখাচ্ছে কল্পনা করে মুচকি হাসল রানা। তারপর ফ্ল্যাশ গানটা ধীরেসুস্থে ক্যামেরার ওপর লাগিয়ে নিল। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখল, সেই ছয়জন ইয়াং টাইগার্স-এর মধ্যেখানে বসে আছে দলপতি জয়দ্রথ মৈত্র। স্টেজের দিকে ওদের কারও চোখ নেই—চাপা গলায় কি যেন আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। নিকন-এফ ক্যামেরায় অ্যাপারচার এফ্ এইট্ দিয়ে ডিসট্যান্স বিশ ফুটে সেট করে নিল রানা। এতে ডেপ্‌থ অফ ফোকাস নয় ফুট থেকে ইনফিনিটি পাওয়া যাবে। একটা আধ-খাওয়া সিগারেট পড়ে আছে সামনে মাটিতে। আগুনটা পিষে ফেলল সে জুতো দিয়ে। জমে উঠেছে নাচ।

ধিক তেই ধিগি তেই। ধিক তেই ধিগি তেই। ধিগি ধিগি থেই।
ধিগি ধিগি ধিক্ থেই। ধিগি ধিগি থেই। তা থেই তা থেই।
থেই তা থা। থেই তা থা। থেই তা। ধিক তেই ধিগি তেই।

ধিক তেই ধিগি তেই। ধিগি ধিগি থেই। ধিগি ধিগি ধিক থেই।
ধিগি ধগি থেই। তা থেই তা থেই। থেই তা থা। থেই তা থা।
থেই তা।
ধা ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা। না তিন তিন না।
তেটে ধিন ধিন ধা।...

এবার এগিয়ে গেল রানা দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করে স্টেজের মাঝ বরাবর। তারপর হঠাৎ ঘুরে, যেন দর্শকদের ছবি তুলছে এমনি ভাবে সেই ছোট্ট দলটির ছবি তুলে নিল। অপ্রস্তুত দলটি ফ্ল্যাশ লাইটের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর জয়দ্রথ ছাড়া বাকি সবার হাত দ্রুত উঠে এসে নিজ নিজ চেহারা আড়াল করার চেষ্টা করল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মৃদু হাসল রানা।

এক, দুই করে নয় সেকেণ্ড পার হলো। জ্বলে উঠল ফ্ল্যাশ গানের পেছনে লাল বাতি। রি-চারজিং সাইকল্ কমপ্লিট হয়েছে। এবার আরও কয়েকটি ছবি তুলল সে মিত্রা সেনের বিশেষ বিশেষ নৃত্য ভঙ্গিমার, বিভিন্ন দূরত্ব থেকে বিভিন্ন অ্যাপারচার দিয়ে। মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলছে রানার। ঢাকার কুখ্যাত ইয়াং টাইগার্স পিছু ছাড়েনি তাহলে। কিন্তু এদের সঙ্গে কলকাতার সাংস্কৃতিক মিশনের দলপতির এই দহরম-মহরম কেন? কুষ্টিয়ায় মিত্রা সেনকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল যারা, যাদের হাত থেকে রানা রক্ষা করেছিল মিত্রাকে কিন্তু প্রতিদানে পেয়েছিল দুর্ব্যবহার, সব জেনেশুনেও তাদের সঙ্গে জয়দ্রথ মৈত্রের এই মৈত্রী কিসের? ঈশ্বরদি জংশনের রিফ্রেশমেন্ট রূমেই প্রথম রানার চোখে পড়ে এদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে জয়দ্রথ মৈত্র। কি মতলব আঁটছে সে এদের সঙ্গে? রাজশাহীতে পৌঁছে ডাকবাংলোতে মিত্রা সেনের ব্যবহারই বা এমন হঠাৎ পাল্টে গেল কেন? ঠিক তার পাশের ঘরটা বুক করল মিত্রা—দলপতি তাতে আপত্তি করল না। ট্রেনে তাহলে গুলিবর্ষণ করল কে? তাছাড়া আজ সারাদিন মনে হচ্ছিল মিত্রা যেন কিছু বলতে চায় তাকে, কিন্তু বলি বলি করেও সুযোগ করে উঠতে পারছে না। কী সে কথা? নিশ্চয়ই কোনও ট্র্যাপ পেতেছে ওরা। সামনে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে রানা।

হঠাৎ রানার মনে হলো মিত্রা যেন তার দিকে চেয়ে আবছা কি একটা ইঙ্গিত করল। আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। শেষ বারের মত ক্লিক করে শাটার টিপে দিল সে। এক ঝলক তীব্র আলো ছুটে গিয়ে আলিঙ্গন করল মিত্রা সেনকে। শাটারের ওপর আঙুলের চাপ পড়তেই এক মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ভিউ ফাইণ্ডার, পরমুহূর্তেই ইনস্ট্যান্ট রিটার্ন মিরর যথাস্থানে ফিরে গিয়ে ভেসে উঠল আবার মিত্রার ছবি। নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়ল রানা। ক্যামেরার লেন্স বদল করছে। আগাগোড়া সবটা ব্যাপার ভেবে দেখা দরকার। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিল সে।

ক্রেধা আধা তেটে তেটে। কৎ তেটে ক্রেধা তেটে। ক্রেধা তেটে ধা।
ক্রেধা তেটে ধা। ক্রেধা তেটে। ক্রেধা আধা তেটে তেটে।
কৎ তেটে ক্রেধা তেটে। ক্রেধা তেটে ধা। ক্রেধা তেটে ধা।
ক্রেধা তেটে। ক্রেধা আধা তেটে তেটে।

কৎ তেটে ক্রেধা তেটে। ক্রেধা তেটে ধা। ক্রেধা তেটে ধা।
ক্রেধা তেটে।
ধা ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা। না তিন তিন না।
তেটে ধিন ধিন ধা।...

মুখে চক্রধর বোল বলছে তবলচি। মিত্রা সেন এবার নাচের মুদ্রায় সে ছন্দকে মূর্ত করে তুলবে। চতুর্গুণ বেড়ে গেছে লয়। অত্যন্ত দ্রুত লয়ে চলছে নাচ।

হঠাৎ মনে হলো যেন মিত্রার পা আর মাটিতে নেই—সারাটা স্টেজময় যেন সে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। মুগ্ধ, চমৎকৃত দর্শকবৃন্দের করতালিতে হলের ছাদ উড়ে যাবার উপক্রম। রানাও অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল—প্রশংসা না করে পারল না মনে মনে। সত্যিকার শিল্প দেশ-জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে।

হাততালি থেমে যেতেই হলের মাঝামাঝি জায়গায় বসে এক ফাজিল ছোকরা 'ম্যা···এ্যা···' করে জোরে ছাগলের ডাক ডেকে উঠল। চাপা হাসির গুঞ্জন উঠল। দু'একটা ধমক-ধামকের আওয়াজও এল।

নিকন এফ-এর লেন্সটা খুলে ফেলল রানা। খুলে ২০০ মি. মি. অটো নিকর এফ-২.৫ টেলিফটো লেন্সটা লাগিয়ে নিল। বেয়োনেট মাউন্টের ওপর ক্লিক করে বসে গেল লেন্স। এবার ক্যামেরাটা চোখে তুলে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করতে চেষ্টা করল সে। টেলিফটো লেন্সের ছোট অ্যাঙ্গেলের মধ্যে মিত্রা সেনকে ধরতে কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল। নিকন-এর উজ্জ্বল ভিউ ফাইণ্ডারের পর্দায় পৃথিবীর অদ্বিতীয় নিকর লেন্সের মাধ্যমে পরিষ্কার ভেসে উঠল এবার মিত্রার সুন্দর মুখচ্ছবি। প্রতিটি রেখা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা। উপলব্ধি করল ও, এ মুখটাও পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। কপালে চাঁদির টিপ আলো পড়ে মাঝে মাঝে ঝিক্ করে উঠছে, দু'চোখে টেনে কাজল পরা, ঠোঁট লিপস্টিকে লাল।

সোজা তার দিকে চেয়ে আবার ইঙ্গিত করল মেয়েটি। না, চোখের ভুল নয়। দূর হলো রানার সন্দেহ।

প্রবল করতালি এবং শেয়ালের ডাকের মধ্যে শেষ হলো নাচ। কালো পর্দাটা ধীরে ধীরে নেমে এসে আড়াল করল মিত্রাকে।

সবাই একসঙ্গে বেরোতে চাইছে হল থেকে। গেটের কাছে দারুণ ভিড় ঠেলে রানা এগোল গ্রীনরুমের দিকে। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ হাত ঢোকাল রানার প্যান্টের পকেটে। ধরতে পারল না রানা হাতটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল একটা লোমশ হাত সরে গেল পেছনের ভিড়ে।

পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট্ট কাগজ পেল রানা। ভাবল, বার্তা হবে কিছু। চারকোনা ছোট কাগজের ওপর ইংরেজিতে টাইপ করা:

BEWARE GENTLEMAN, DANGER AHEAD!

প্রথমেই রানা ভাবল: টাইপ করা যখন, এটা তাকে দেবে বলে কেউ আগে থেকেই মনস্থ করে এসেছে, হঠাৎ তার মাথায় আসেনি এই সাবধানবাণী—অর্থাৎ, পূর্ব-পরিকল্পিত। কিন্তু কে তাকে সাবধান করতে চায়, শত্রু না মিত্র? এবং কেন? কিসের বিপদ সামনে? ঘাই হরিণীর মত কি মিত্রা ডাকছে তাকে মৃত্যুর পথে? নাকি কেউ ভয় দেখিয়ে দূরে সরাতে চাইছে ওকে?

দুই হাত মাথার ওপর তুলে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল রানা—যেন ওর ওপর যে বা যারা লক্ষ রাখছে, তারা স্পষ্ট দেখতে পায় ওর কার্যকলাপ। তারপর ওপর দিকে টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে দিল চারদিকে। আশেপাশে সবার মাথায় ঝরে পড়ল সেগুলো পুষ্প বৃষ্টির মত।

ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে স্টেজের পেছন দিকে চলে এল রানা। গেটের কাছে দাঁড়ানো বুকে নীল ব্যাজ আঁটা ভলান্টিয়ার রানাকে দেখে পথ ছেড়ে দিল। ভেতরে ঢুকে এদিক ওদিক চাইতেই একটা ছোট ঘরের আধ-ভেজান দরজা দিয়ে মিত্রা সেনকে দেখতে পেল রানা। দ্রুত কাপড় ছাড়ছে সে। স্টেজের পেছনে অনাদর অবহেলায় পড়ে থাকা গোটাকতক ক্যানভাসের উইং, এলোমেলো করে ফেলে রাখা কয়েকটা বাঁশ আর কিছু নারকেলের রশি টপকে ড্রেসিংরুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

'ভেতরে আসুন!' মিত্রার চাপা কণ্ঠস্বর।

ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল রানা। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? এভাবে হুট করে ড্রেসিংরুমে ঢুকে পড়া···

'কই, দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন।'

এবার রানার টনক নড়ল। মেয়েটির চাপা খসখসে অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ধৈর্যচ্যুতির আভাস পাওয়া গেল। এ যেন অনুরোধ নয়, আদেশ। ঢুকে পড়ল রানা ঘরের ভেতর।

'ছিটকিনি লাগিয়ে দিন দরজার। লজ্জা করার সময় এটা নয়। জরুরী কথা আছে। দোহাই আপনার, বোকার মত দাঁড়িয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি করুন—সময় নেই মোটেও। এক্ষুণি ওরা সব এসে পড়বে।'

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে এমন একটা উত্তেজিত জরুরী ভাব প্রকাশ পেল যে প্রায় চমকে উঠল মাসুদ রানা। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল তার। অদ্ভুত কিছু শুনবার জন্যে মনটাকে প্রস্তুত করে নিল সে মুহূর্তে।

নড়বড়ে বল্টুটা লাগানো না লাগানো সমান কথা। তবু সেটা লাগিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। স্থির দৃষ্টিতে আপাদমস্তক একবার দেখল মিত্রাকে। ভাবল, হঠাৎ আজ এই মুহূর্তে নিজের দলটা 'ওরা' হয়ে গেল কেন এই মেয়েটির কাছে? কুষ্টিয়ার অনুষ্ঠানে তার প্রতি স্পষ্ট ঘৃণা দেখতে পেয়েছে রানা মিত্রার চোখে। আজ সে-ই আপন লোক হয়ে গেল, অন্যেরা পর—কেমন করে হয়! এর মধ্যে গোলমাল আছে কিছু। সাবধান!

'আপনাকে এখানে ঢুকতে দেখেছে কেউ?' জিজ্ঞেস করল মিত্রা।

'বোধহয় না,' উত্তর দিল রানা নিরাসক্ত কণ্ঠে। এগিয়ে গিয়ে গ্যাজেট ব্যাগ আর ফ্ল্যাশ-গানটা নামিয়ে রাখল একটা চেয়ারের ওপর। বলল, 'কি ব্যাপার মিত্রা সেন? আকারে ইঙ্গিতে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি আমাকে?'

'আপনার, আমার দু'জনের সামনেই ভয়ানক বিপদ এখন।'

গ্রীনরুমের পেছন দিকের খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঠাণ্ডা এক ঝলক মুক্ত বাতাস এল জানালা দিয়ে। বুক ভরে শ্বাস গ্রহণ করল সে। বাইরে প্রায় জানালার সঙ্গে লাগানো একটা কচুরিপানা ভর্তিপুকুর। কানায় কানায় টইটম্বুর।

মোলায়েম জ্যোৎস্নায় পুকুরপাড়ের নারকেল গাছ দুটোকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে দেখতে। রানা ভাবে, 'সুন্দর' আর 'বিপদ' এই দুটো জিনিসে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ জিনিস যা সুন্দর, রানা দেখেছে তার আশেপাশে ওত পেতে থাকে বিপদ। অপূর্ব সুন্দরী এই মেয়েটির চারপাশে বিপদ ঘনিয়ে আসবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

পাশে এসে দাঁড়াল মিত্রা।

'একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্তের জাল পাতা হয়েছে আপনার জন্যে, মি.…'

'আমি নগণ্য এক ফটোগ্রাফার—তরিকুল ইসলাম। আপনি এসব কি ভয়ঙ্কর কথা শোনাচ্ছেন?' সত্যিসত্যিই বিস্মিত হবার ভান করল রানা।

'বাজে সময় নষ্ট করবেন না, মি. মাসুদ রানা।' মিত্রার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট তিরস্কার। 'সেই প্রথম দিন থেকেই আমি কেন, সাংস্কৃতিক মিশনের প্রত্যেকটি লোক জানে আপনার আসল নাম, পরিচয়। হাতে সময় নেই, এক্ষুণি ওরা এসে পড়বে, দয়া করে আমার কথাগুলো বলতে দিন।' কপাল থেকে একগুচ্ছ অবাধ্য চুল নিয়ে গুঁজে দিল মিত্রা কানের পাশে। তারপর আবার বলল, 'আজ রাতে আপনাকে খুন করা হবে, মি. রানা!'

মিত্রার মুখে নিজের নাম শুনে অবাক হলো না রানা। মনে মনে ভাবল, আমাকে খুন করা হলে তোমার কি ক্ষতি, সুন্দরী। মুখে বলল, 'কেন? আমার অপরাধ?'

'দলপতির বিশ্বাস, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এমন কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন যা আমাদের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কাজেই আর কোন পথ নেই; সরিয়ে দিতে হবে আপনাকে এই পৃথিবী থেকে। আর আপনাকে এই নিশ্চিত মৃত্যুর ফাঁদে ফেলবার জন্যে আমাকে ওরা ব্যবহার করছে টোপ হিসেবে।' খুব দ্রুত কথাগুলো বলে গেল মিত্রা। ওর চোখে-মুখে স্পষ্ট উত্তেজনা।

'চক্রান্ত, ফাঁদ, মৃত্যু, এইসব দুঃসংবাদ শুনে মন খারাপ করছে, কিন্তু টোপটা আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। আমি এই টোপ গিলতে রাজি আছি। যা থাকে কপালে!' হাসল রানা।

'আপনি হাসছেন? উহ্, এর গুরুত্ব যদি আপনাকে বোঝাতে পারতাম!' তর্জনী ভাঁজ করে কামড়ে ধরল অসহিষ্ণু মিত্রা সেন। 'ওই যে ওরা সব এসে পড়েছে!'

বাইরে কয়েকটা পায়ের শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে আসছে কারা কাঠের মেঝের ওপর মচ্‌মচ্ শব্দ তুলে। আর সময় নেই। রানা চেয়ে দেখল উত্তেজনা, ভয় আর হতাশায় রক্তশূন্য হয়ে গেছে মিত্রার মুখ। বুঝল, এটা অভিনয় হতে পারে না।

হঠাৎ রানার বাঁ হাতটা তুলে নিল মিত্রা তার হাতে। চাপা গলায় বলল, 'আমাকেও জড়িয়েছে ওরা। এই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র যদি সফল হয় তবে আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকবে না আমার। আমি বাঁচতে চাই, রানা! এই বিদেশে আপন কেউ নেই আমার। মৈত্র মশাই নিজেই এই চক্রান্তের উদ্যোক্তা। আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে এরা বানের জলে। রক্ষা করবে আমাকে, রানা? তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি আমি। বলো, বাঁচাবে আমাকে?'

আকুল মিনতি মিত্রার চোখে। রানা বুঝল, সে এমন একটা ফাঁদে পা দিতে

যাচ্ছে যেখান থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে। স্থির দৃষ্টিতে মিত্রার চোখের দিকে চেয়ে সে বুঝল এই কাতর মিনতি অবহেলা করবার সাধ্য তার নেই। কিন্তু কি সেই চক্রান্ত যাকে মিত্রার এত ভয়? লোকগুলো দরজার কাছে এসে গেছে। আর সময় নেই সব কথা শুনবার।

'চেষ্টা করব,' বলল রানা।

মিত্রার কাছে এই আশ্বাসটুকুর অনেক দাম। কৃতজ্ঞতায় দু'ফোঁটা জল বেরিয়ে এল ওর চোখ থেকে। রানার বাঁ হাতটায় আলতো করে চাপ দিয়েই ছেড়ে দিল।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

'নিজেকে বড় স্বার্থপর বলে মনে হচ্ছে। নিজের বিপদ উদ্ধারের জন্যে জেনে শুনে তোমাকে মৃত্যু-ফাঁদে পা দেবার অনুরোধ করছি। কিন্তু আমি বড় অসহায়। তুমি জানো না কত ভয়ঙ্কর লোক ওরা।' শিউরে উঠল মিত্রা। 'আরেকটা শেষ কথা—যদি দ্বিধা হয়, যদি মৃত্যুর ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে, তবে বাঁচার পথও বলে দিচ্ছি—আজ রাতে কিছুতেই ঘর থেকে বেরিয়ো না। কোন অবস্থাতেই না। আমার যা হওয়ার হোক···'

মিত্রার খসখসে কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে প্রবল বেগে আবার কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

'তুমি লুকিয়ে পড়ো কোথাও।'

'না।' গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়ে রানা দেয়ালে বসানো চার বাই তিন ফুট আলমারিটার ছোট্ট তালা এক ঝটকায় ভেঙে ফেলল। যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। ডালাটা খুলতেই দেখা গেল একখানা জাপানী ট্র্যানজিস্টর টেপ-রেকর্ডার। নিশ্চিন্ত মনে ঘুরছে দুটো স্পূল। ওদের কথাবার্তা সব রেকর্ড হয়ে গেছে।

ক্ষুদ্রাকৃতি স্পূল দুটো তুলে নিল রানা টেপ-রেকর্ডার থেকে। তারপর গ্রীনরুমের পেছনের খোলা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল পানা ভর্তি পুকুরে।

'তুমি জানতে?' আলমারির ডালাটা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না।'

এবার প্রবল এক ধাক্কায় ছিটকিনি ভেঙে দু'ফাঁক হয়ে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল জয়দ্রথ মৈত্র। পেছনে আরও কয়েকজন লোক।

হলুদ দৃষ্টি মেলে দু'জনকে দেখল জয়দ্রথ মৈত্র। তারপর বলল, 'সরি ফর দা ইন্টারাপশন।' পরিষ্কার বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে।

'দ্যাট্‌স অল রাইট,' উত্তর দিল রানা। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে মৈত্রকে পাশ কাটিয়ে চেয়ার থেকে গ্যাজেট ব্যাগ আর ফ্ল্যাশগানটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যেতে যেতে মিত্রার কৈফিয়ত কানে গেল তার।

'উনি একটা ক্লোজ-আপ ছবি নিতে···'

'দরজা বন্ধ করে নিয়েছিলে কেন?'

'আমি, মানে, উনি···'

মৃদু হেসে রাস্তায় গিয়ে পড়ল মাসুদ রানা।

দুই

২৭ আগস্ট, ১৯৬৫

মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ায় ছয়তলার ওপর একটা কার্পেট বিছানো ঘরের পশ্চিমমুখী জানালাটা খোলা। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট মাসুদ রানা সে-জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আনমনে স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসের দিকে চেয়ে রয়েছে। অসম্ভব বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে পানি জমে আজ বিকেলের ফুটবল খেলা বাতিল হয়ে গেছে। পতাকা নামিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বেশ কিছুক্ষণ হয় বৃষ্টি থেমেছে। পশ্চিম আকাশের সাদা মেঘের গায়ে এখন নানা রঙের খেলা। দর্শকদের গ্যালারি একেবারে ফাঁকা। দুটো ছাগল, বোধহয় দারোয়ানের হবে, নিশ্চিন্ত মনে চরছে মাঠে। পাশে সুইমিং পুলের টলটলে পরিষ্কার জলে সাঁতার অভ্যাস করছে আট-দশজন তরুণ। বায়তুল মোকাররমের গম্বুজের ওপর চোখ পড়ল এবার রানার। তারপর সিঁড়িতে। জনা কয়েক মুসল্লি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন মগরেবের আজান শুনে। প্রকাণ্ড জি. পি. ও. বিল্ডিংটা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ডেড লেটার-এর বোঝা বুকে নিয়ে। আরও অনেক দূরে রেসকোর্সের শিব মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে আবছা। ঢাকা নগরীর বুকে সন্ধ্যা নামছে ধীরে ধীরে।

হঠাৎ সাইলেন্সার পাইপ-ভাঙা একটা বেবী ট্যাক্সি এমন বেয়াড়া শব্দ করে সামনের রাস্তা দিয়ে চলে গেল যে রানার বিরক্ত দৃষ্টি এইসব সুন্দর দৃশ্য ছেড়ে ফিরে এল কালো পীচ ঢালা ভেজা রাস্তাটার ওপর। সাইড লাইট জ্বেলে মৃদু গুঞ্জন তুলে হরেক রঙের সুন্দর সুন্দর স্যালুন, সেডান চলে যাচ্ছে ছবির মত। অপেক্ষা করছে রানা।

'এক কাপ কফি দেব?' মোলায়েম নারী কণ্ঠের প্রশ্নে চমকে উঠল রানা। দেখল নব-নিযুক্ত সুন্দরী স্টেনো টাইপিস্ট নাসরীন রেহানা এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। রানার কাজের সুবিধার জন্যে ওকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে।

এরা আবার কফি খাওয়ায় নাকি? শিওর হওয়া দরকার। 'কি বলছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কফি?'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানার।

'বাতিটা জ্বেলে দাও, রেহানা। আর হ্যাঁ, কফি এক কাপ দিতে পারো। তার আগে এক দৌড়ে U-সেকশন থেকে একটা ফাইল নিয়ে এসো। ফোনে পারটিকুলারস দিয়ে দিয়েছি, মিসেস চৌধুরীর কাছে চাইলেই পাবে। কুইক্।'

'রাইট, স্যার,' লাইট জ্বেলে দিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটা ঘর থেকে। খুশি হয়ে উঠল রানা—বেশ কাজের মেয়ে মনে হচ্ছে!

ফাইলটা দেখেই চমকে উঠল রানা। তাহলে এই ব্যাপার! আবার সেই ইণ্ডিয়া? অল্প কিছুক্ষণ আগে মেজর জেনারেল রাহাত খানের আদেশ এসেছিল ইন্টারকমে—'রানা, U-সেকশন থেকে IF/VII/65 ফাইলটা আনিয়ে পড়ে ফেল।

লিখে নাও: IF/VII/65। আমি একটু ডিফেন্স সেক্রেটারির অফিসে যাচ্ছি। অল্পক্ষণেই ফিরব। তুমি অফিসেই থেকো—কথা আছে।'

তখনই বুঝেছিল রানা, বুড়োর মাথায় নতুন কোন পোকা ঢুকেছে। ফাইলটা দেখেই টের পেল আর একটা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি হচ্ছে তার জন্যে। আবার শক্তি পরীক্ষায় নামতে হবে তাকে কোন বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে। খুশি হয়ে উঠল রানার মন।

ফাইলের পাতায় ডুবে গিয়েছিল মাসুদ রানা। একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে সেটা ধরিয়ে নিতেও ভুলে গিয়েছিল। শেষ পাতাটা ওল্টাতেই হঠাৎ খট করে একটা শব্দে চমকে উঠল রানা। দেখল ওর রনসন লাইটারের ছোট্ট চোয়ালটা হাঁ হয়ে আছে। রেহানার হাতে ধরা সেটা।

সিগারেট ধরিয়ে রানা বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম, স্যার। আপনার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

ফাইলটা বন্ধ করে কফির কাপে চুমুক দিল রানা। তারপর সপ্রশংস দৃষ্টিতে রেহানার দিকে চেয়ে বলল, 'অপূর্ব হয়েছে তো কফিটা। বানিয়েছে কে?'

'আমি।'

'চমৎকার! ভেরি গুড, ভেরি গুড। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, রেহানা। ওই বুড়োকে (ছাতের দিকে চোখের ইঙ্গিত করল রানা) কোন দিন কফি খাওয়াতে পারবে না।'

'কেন?' সত্যিই বিস্মিত হলো রেহানা। 'ওঁকে কফি খাওয়ালে কি হবে?'

'এক কাপ কফি খেলেই বুড়ো তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিজের স্টেনো করে নেবে। আর ওই গোলাম সারওয়ার ভূতটা এসে পড়বে আমার ঘাড়ে।'

'তাহলে ভালই হবে,' হেসে ফেলল রেহানা। সহজ হতে পেরে যেন বেঁচে গেল ও।

ঠিক এমনি সময়ে ইন্টারকমের মধ্যে থেকে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন চাবুক মারল রানাকে।

'ওপরে এসো, রানা। আর এইসব হালকা আলাপ করবার সময় ইন্টারকমের সুইচটা অফ করে দিয়ো।'

জিভ কাটল রেহানা চোখ বড় বড় করে।

'সরি, স্যার। এক্ষুণি আসছি, স্যার,' বলেই অফ করে দিল রানা ইন্টারকমের সুইচ। যেন চুরি করে ধরা পড়েছে এমনি মুখের ভাব হলো ওর।

নিজের টাইপ রাইটারের সামনে ফিরে গিয়ে মুখটা হাঁ করে নিঃশব্দে হাসছে রেহানা রানার এই পর্যুদস্ত অবস্থায় আন্তরিক খুশি হয়ে। জোরে হাসতে সাহস হচ্ছে না, পাছে রাহাত খান শুনে ফেলেন। পিত্তি জ্বলে গেল রানার তাই দেখে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সে রেহানার ডেস্কের সামনে। তারপর ধাই করে প্রচণ্ড এক কিল বসাল ডেস্কের ওপর। আধ হাত লাফিয়ে উঠল টাইপ রাইটার।

'হাসছ কেন? ফাজিল মেয়ে কোথাকার! এত হাসির কি আছে?'

রানার ছেলেমানুষি রাগ দেখে এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল রেহানা। তীব্র দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তার প্রতি কপট অগ্নি বর্ষণ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল রানা

ঘর থেকে।

সাততলার ওপর গোলাম সারওয়ারের কামরার মধ্যে দিয়ে গিয়ে মেজর জেনারেল রাহাত খানের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। হাতলে হাত দিয়ে, বরাবর যেমন হয়, হঠাৎ বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল এক ঝলক রক্ত। অন্যমনস্ক ভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ সামনে লোক পড়ে গেলে যেমন হয় তেমনি। ছুরির ফলার মত শান দেয়া ক্ষীণ দীর্ঘকায় এই বুদ্ধিমান লোকটির তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ভাবলেই কেন জানি রানার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে। এই বৃদ্ধকে সে কতখানি ভালবাসে, কত ভক্তি করে তা সে জানে; কিন্তু এত ভয় যে কেন করে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না রানা।

মস্ত এয়ার-কণ্ডিশনড রুমে একটা দামী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে পিঠ-উঁচু রিভলভিং চেয়ারে সোজা হয়ে বসে একটা প্যাডের উপর খস খস করে কি যেন লিখছেন রাহাত খান। চোখ না তুলেই বললেন, 'বসো।'

একটা চেয়ারে বসে ঘরের চারধারে চেয়ে দেখল রানা। মাস চারেক আগে যেমন দেখেছিল প্রায় তেমনি ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে ঘরটা। বদলের মধ্যে এই টেবিলের ওপর কিং সাইজ চেস্টারফিল্ডের বদলে এক বাক্স হল্যাণ্ডের তৈরি হাডসন হাভানা চুরুট। সপ্রতিভ অভিজাত চেহারায় এতটুকু পরিবর্তন নেই। তেমনি ধবধবে সাদা ইজিপশিয়ান কটনের স্টিফ কল্যার শার্ট, সার্জের স্যুট আর ব্রিটিশ কায়দায় নট বাঁধা দামী টাই।

'হংকং-এর ব্ল্যাকহক অ্যাসাইনমেন্ট-এ আমাদের সাফল্যে চাইনিজ গভর্নমেন্ট এতই সন্তুষ্ট হয়েছে যে পি.সি.আইকে কংগ্রাচুলেট করে বার্তা পাঠিয়েছে একটা। কিন্তু আমার ধারণা অতখানি ঝুঁকি নেয়া তোমার উচিত হয়নি। ডক্টর হকের পুরো রিপোর্ট আমি পড়ে দেখেছি। ছোরাটা আর এক ইঞ্চি বাম দিকে লাগলেই তোমার দুঃসাহসের ইতি হয়ে যেত। যাক, এখন বিষের ক্রিয়া আর নেই। এফ-সেকশন তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে সারটিফাই করছে।'

রানা কোনও কথা বলল না। বুঝল, এই কথাগুলোর মানে এবার নতুন কাজের ভার নিতে হবে তোমাকে, প্রস্তুত হয়ে নাও। বাক্স থেকে একখানা সেলোফেন পেপার মোড়া সিগার বের করে সযত্নে কাগজ ছাড়িয়ে ধরিয়ে নিলেন রাহাত খান রানার উপহার দেয়া রনসন ভ্যারাফ্লেম গ্যাস লাইটার জেলে। দামী তামাক পাতার কড়া গন্ধ এল নাকে।

'ইউ-সেকশনের ওই ফাইলটা পড়েছ? কি লিখেছে ওতে?'

'পড়েছি, স্যার। সাংস্কৃতিক মিশন এসেছে কলকাতা থেকে গত বাইশ তারিখে। নাচ-গান-বাজনার জন্যে জনা পনেরো শিল্পী আর দশ-বারোজন টেকনিশিয়ান এসেছে স্টেজ ডেকোরেশন, মাইক ও লাইট কন্ট্রোলের জন্যে। নামগুলো মনে নেই, স্যার। পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছে ওরা।'

'ব্যস! এই? আর কিছু চোখে পড়েনি তোমার?'

'আর একটা ব্যাপারে একটু খটকা লেগেছে, স্যার। ঢাকার পরেই চিটাগাং যাওয়া উচিত ছিল ওদের। তা না গিয়ে ওরা গেছে খুলনায়। তারপর যশোর। ওদের

প্রোগ্রাম দেখছি: খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী এবং দিনাজপুর। অর্থাৎ আগাগোড়া পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত বা পশ্চিম-বঙ্গের পূর্ব সীমান্ত ধরে।' রাহাত খানের মুখের দিকে চেয়ে রানা দেখল একটা প্রশংসা-সূচক সূক্ষ্ম হাসির রেখা। রানা তাঁর দিকে চাইতেই মিলিয়ে গেল হাসিটা।

'বেশ। এখন বলো দেখি অল ইণ্ডিয়া রেডিও যখন দৈনিক চারপাঁচ ঘণ্টা চিৎকার করে পৃথিবীর কাছে নালিশ জানাচ্ছে আমরা কাশ্মীরে ইনফিলট্রেটর ঢুকিয়েছি, ছত্রী সেনা এবং স্যাবোটিয়ার পাঠিয়েছি শ্রীনগরে, কাশ্মীরের মুক্তি-সংগ্রামীরা আসলে পাকিস্তানী সৈন্য ইত্যাদি, ইত্যাদি; ঠিক সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা মিশন পাঠাবার পেছনে কি মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে? নিশ্চয়ই এদের কোন বিশেষ মতলব বা স্বার্থ লুকানো আছে এর পেছনে। তাই না?' পায়ের ওপর পা তুলে একটু আরাম করে বসলেন রাহাত খান।

'অসম্ভব নয়,' উত্তর দিল রানা।

'কী সেই স্বার্থ, তাই বের করতে হবে তোমাকে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ। এ কাজের ভার ছিল আমাদের খুলনা এজেন্ট রহমানের ওপর। সে এদের সঙ্গে আঠার মত লেগে গিয়েছিল। হয়তো কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছিল। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক আগে খবর এসেছে তাকে কেউ নির্মমভাবে হত্যা করেছে। যশোর এয়ারপোর্টের কাছে একটা ঝোপের ধারে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া গেছে।'

'আমাদের রহমান!' অবাক হয়ে গেল রানা। রহমানের প্রাণবন্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাটা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। কিন্তু আমাদের দেশে এসে আমাদের লোক মেরে রেখে যাবে, এ কেমন কথা!

রানার চোখে সংকল্প দেখতে পেলেন রাহাত খান। কয়েক সেকেণ্ড সময় দিলেন ওকে সামলে নেয়ার জন্যে। নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন। তারপর আবার আরম্ভ করলেন, 'কাল দশটার ফ্লাইটে তুমি যাবে ঈশ্বরদি। টিকেট বুক করা হয়ে গেছে। ওখান থেকে ট্রেনে যাবে কুষ্টিয়ায়। তোমার নাম তরিকুল ইসলাম, এ.পি.পি.-র ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফার। আইডেন্টিটি কার্ড এবং অন্যান্য টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস সকালে তোমার বাসায় পৌঁছে যাবে।'

'ঠিক কি ধরনের কাজ হবে আমার, স্যার?'

'ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবে। সোহেলকে পাবে ডাকবাংলোর বয়-বেয়ারাদের মধ্যে। ও তোমাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে। আমার যতদূর বিশ্বাস, একটা ভয়ানক প্ল্যান এঁটেছে ওরা এবার। অনেক আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে। আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তবে কত সাঙ্ঘাতিক আঘাত আসছে আমাদের দেশের ওপর তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ডিফেন্স সেক্রেটারি আজ আমার অনুমান শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন। বেয়ারাকে ডেকে ঠাণ্ডা একগ্লাস পানি খাওয়াতে বললেন আমাকে।' বিরক্তিতে কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল রাহাত খানের। 'কিন্তু তুমি তো আমাকে চেনো, রানা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাহাত খান। তারপর বিশাল কমপিউটারের

সামনে গিয়ে কয়েকটা বোতাম টিপে দিলেন। কয়েকটা বাতি জ্বলল নিভল ঘড়র্ ঘড় শব্দ হলো ওর ভেতর থেকে। আধুনিকতম বিরাটকায় কমপিউটার প্রয়োজনীয় তথ্য টাইপ করে দিল। কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে রানার হাতে দিয়ে রাহাত খান বললেন, 'কলকাতা থেকে এই ইনফরমেশন এসেছে।'

রানা চোখ বুলাল কাগজটার ওপর। বাংলা করলে দাঁড়ায়:

গুরুতর কিছু একটা চলছে টিটাগড়ে। নাম দিয়েছে অপারেশন গুডউইল।

সাংস্কৃতিক মিশনটা এই ব্যাপারে জড়িত। গ্রুপ লিডার হচ্ছে 'এইচ'।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার কথা ক'টা পড়ে।

'ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছ এবার?' রানা মাথা নাড়লে আবার আরম্ভ করলেন রাহাত খান। 'H যেখানে দলপতি হয়ে এসেছে সেখানে রহমানকে দেয়া আমারই ভুল হয়ে গিয়েছিল। বিপদের জন্যে আমাদের রহমানও প্রস্তুত ছিল—কিন্তু মৃত্যুর জন্যে কে কখন প্রস্তুত থাকে? একটু কোথাও ভুল করেছে—ব্যস···।'

ডান হাতটা উপুড় করে রাখা ছিল টেবিলের ওপর, তিন ইঞ্চি ওপরে উঠিয়ে কব্জি থেকে সামনেটুকু ডান দিকে দ্রুত একবার ঝাঁকালেন রাহাত খান। অর্থাৎ—খতম।

'কাজেই সাবধান। রহমানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব আমরা। চুপচাপ হজম করব না। কিন্তু প্রথমে ওদের উদ্দেশ্য জানা দরকার। ও হ্যাঁ, ভাল কথা। ইয়ং টাইগারস্-এর নাম শুনেছ?'

'ইদানীং বেশ শোনা যাচ্ছে এদের নাম, স্যার। কতকগুলো বড়লোকের ছেলে।'

'হ্যাঁ। পূর্ব-পাকিস্তানে সব বাঘা বাঘা শিল্পপতিরা মিলে করেছে টাইগারস্ ক্লাব—আর তাদের বখে যাওয়া অপদার্থ ছেলেরা মিলে গড়েছে ইয়ং টাইগারস্। কোটিপতি বাপের টাকার জোরে মদ-জুয়া-মেয়েমানুষ নিয়ে যথেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছে। ওদের কয়েকটা অপকর্মের কথা আমার কানে এসেছে। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি টাকার জোরে ফাইল গায়েব। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন নানান অপকৌশলের সাহায্যে ভাল ভাল এক আধটা ইণ্ডাস্ট্রি বাগিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। যাক, যশোর থেকে খবর এসেছে কয়েকজন ইয়ং টাইগারস্ এই মিশনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। একজন নর্তকীর ওপর নাকি তাদের চোখ। এদেরও আণ্ডার-এস্টিমেট কোরো না। প্রয়োজন হলে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা কোরো না। আমার সমর্থন থাকবে তোমার পেছনে। এখন তোমার কোন প্রশ্ন আছে?'

'না, স্যার।'

কেন জানি রানার মনে হলো কোন কারণে রাহাত খান ভেতর ভেতর বড় উদ্বিগ্ন এবং বিরক্ত। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। ব্যক্তিগত প্রশ্ন পছন্দ করেন না রাহাত খান। হয়তো H-এর ধৃষ্টতা এই উদ্বেগের কারণ হবে। রহমানের মৃত্যু হয়তো কুরে কুরে যন্ত্রণা দিচ্ছে ওঁকে।

প্যাড থেকে একটা কাগজ টান দিয়ে ছিঁড়ে চার ভাঁজ করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'এতে যা লেখা আছে কাল প্লেনে উঠে তারপর পড়বে। আজ সাতাশে

আগস্ট—ওরা আছে যশোরে, কুষ্টিয়ায় থাকবে আটাশ-উনত্রিশ, রাজশাহীতে তিরিশ-একত্রিশ, দিনাজপুরে পয়লা-দোসরা। কথাগুলো মনে রেখো। আর কেবল বিপদ নয়, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থেকো। ব্যস, আর কোন কথা নেই, যেতে পারো।'

আস্তে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা ঘর থেকে।

তিন

২৮ আগস্ট, ১৯৬৫

মোখলেস এসে খবর দিল ট্যাক্সি এসে গেছে। অর্থাৎ, এবার দয়া করে গাত্রোত্থান করুন।

'তুই আমার সুটকেসটা তুলে দে তো গাড়ির পেছনে,' রানা বলল।

'দিয়েছি, স্যার।'

'তবে যা ভাগ এখান থেকে। চা খেয়ে নিই—দাঁড়াতে বল ড্রাইভারকে।'

রানাকে দেখেই লাফিয়ে ট্যাক্সির ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে এল ড্রাইভার। বেঁটে-খাটো হাসি-খুশি চেহারার লোকটা। ঢিলা খাকি কোর্তার বুক পকেট দুটো ফুলে আছে রুমাল, লাইসেন্স, টাকা পয়সা, কিংস্টর্ক সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, চিরুনি আর হরেক রকম হাবিজাবি কাগজে। ময়লা পাজামার ততধিক ময়লা ফিতে ঝুলছে হাঁটুর কাছে। পায়ে প্রচুর ঝড়-ঝাপটাতেও টিকে থাকা একটা থ্যাবড়া নাকের লেস-হীন জুতো। লোকটার বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে। সামনের দিকে একটা দাঁত নেই—সেই ফাঁকের মধ্যে একটা খেলাল ধরা। মিলিটারি কায়দায় ঝটাং করে এক স্যালিউট লাগিয়ে দিল সে রানাকে দেখে আনন্দের আতিশয্যে। 'থুক' করে মুখ থেকে খেলালটা ফেলে দিয়ে ফোকলা হাসি হাসল।

'আরে, হুজুর, আপনে! আপনেরে বিচরাইতে বিচরাইতে তো এক্কেরে পেরেশান হোইয়া গেছি গা।' পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখল সে রানাকে। 'আমি দিলে ভাবি, মানুষটা গেল কই? এক্কেরে গায়েব হোইয়া গেল গা? ইমুন সাংগাতি পাওলানটারে হালায় একখি চাটকানা মাইরা রাবিস বানাইয়া ফালাইল। হিকমতটা কি...আরিব্বাপরে বাপ!'

রানাকে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বলল, 'আরে উইঠা পরেন, হুজুর; খামোস খায়া খাড়োয়া রইলেন কেলেগা?'

এমন বিচিত্র ভাব সংমিশ্রিত আকস্মিক অভ্যর্থনায় অবাক হয়ে গিয়েছিল রানা। ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে বসল সে। তারপরই মনে পড়ল সেই ঘটনার কথা। মাস ছয়েক আগে রাত প্রায় এগারোটার দিকে সাভার আর নয়ারহাটের মাঝামাঝি জায়গায় জঙ্গলের ধারে এর গাড়ি আটক করেছিল একদল দুর্বৃত্ত। রানা আসছিল মানিকগঞ্জ থেকে। দূর থেকেই ব্যাপারটা আঁচ করে হেড লাইট অফ করে গিয়ার নিউট্রাল করে নিঃশব্দে একেবারে কাছাকাছি এসে থেমেছিল রানা। প্রাণ ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল আর ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল ড্রাইভার। ছোরা মারার ঠিক আগের মুহূর্তে যমদূতের মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রানা ওদের ওপর। বেশ

মারপিটও হয়েছিল। বেগতিক দেখে পালিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল (কী যেন নাম বলেছিল—ও, হ্যাঁ) ইদু মিঞার। সেই কৃতজ্ঞতা এই খাস ঢাকাইয়া কুট্টির মনে যে এমনই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে ভাবতে পারেনি রানা।

'কেমন আছ, ইদু মিঞা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যিমুন দোয়া করছেন, হুজুর।' বলেই গাড়িতে স্টার্ট দিল ইদু মিঞা। ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে ক্লাচটা ছাড়ার কায়দা দেখে বুঝল রানা, পাখোয়াজ ড্রাইভার।

হঠাৎ চোখ পড়ল রানার দরজায় দাঁড়ানো রাঙার মার ওপর। মুখের দিকে চেয়েই বুঝল রানা, অনর্গল দোয়া-দরুদ পড়ছে বুড়ি। গত রাতে জিনিসপত্র গোছগাছ করা দেখেই কয়েক রাকাত নামাজ বেড়ে গেছে বুড়ির। সাধে আর মোখলেস ওকে 'রান্যার মা' বলে খেপায় না। কোথায় যেন ওর মৃত মায়ের সঙ্গে মিল আছে এই স্নেহময়ী বৃদ্ধার। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়তে যাচ্ছিল, সচেতন হয়ে সামলে নিল রানা।

'রাতের বেলা আর সাভারের দিকে যাও না তো, ইদু মিঞা?'

'তোবা, তোবা। এই জিন্দেগীর মোদে তো আর না। আইজ ষোলো বচ্ছর ডাইবোরি করতাছি হুজুর, যাই নাইক্কা। আর উই দিনকা যে কি অইল—হালায় এউগা পাসিঞ্জার, আমাগো মাহাল্লারই কন্টেকদার···' হঠাৎ থেমে গিয়ে কণ্ঠস্বর নামিয়ে ইদু মিঞা বলল, 'আপনের পিছে আই. বি. লাগছে, হুজুর!'

'কি করে বুঝলে?' ঘাড় না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এউগা মার্সিডিচ আইতাছে পিছে পিছে। পুরানা পল্টন থেইকা লাগছে পিছে! খারোন সাব, টাইম তো আছে। সিজিল কইরা দেই হালারে।'

হেয়ার রোড দিয়ে বেরিয়ে সাকুরার সামনে উঠে ডান দিকে না গিয়ে বাঁয়ে চলল ইদু মিঞা। রেডিও পাকিস্তান ছাড়িয়ে রিয়ার ভিউ মিররের দিকে চেয়ে বলল, 'আইতাছে।'

শাহবাগের ঝর্ণাটা চট করে ঘুরেই আবার এয়ারপোর্টের দিকে চলতে থাকল ট্যাক্সি।

'চেহারাটা দেইখা রাখেন, হুজুর।'

ওয়ান ওয়ে রোড। আত্মগোপন করার উপায় নেই। কালো মার্সিডিস বেঞ্জের ড্রাইভিং সীটে গোঁফদাড়ি পরিষ্কার করে কামানো সানগ্লাস পরা একজন ফর্সা লোক সোজা সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে। এক নজরেই রানা বুঝল লোকটা ভারতীয় গুপ্তচর।

যখন সত্যিসত্যিই পেছনের গাড়িটাও ঝর্ণা ঘুরে এয়ারপোর্ট রোড ধরল তখন দ্রুত একটা বালি ভরা ট্রাককে ওভারটেক করে পেট্রল পাম্প ছাড়িয়ে হাতির পুলের দিকে মোড় নিল ইদু মিঞা। পাওয়ার হাউসের পাশ দিয়ে যেতে বাতাসে ভেসে আসা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় সামনের উইণ্ডস্ক্রীন ঝাপসা হয়ে গেল। ওয়াইপারটা চালু করে দিয়ে প্রায় এক লাফে পুলটা পার হয়ে গেল ইদু মিঞার ট্যাক্সি। পুল থেকে নেমেই ডান দিকে মোড় ঘুরে নানান গলি ঘুঁচি পেরিয়ে গ্রীন রোডে গিয়ে পড়ল এবার ওরা। তারপর সোজা এয়ারপোর্ট।

ফার্মগেটের কাছে এসেই গাড়ি থামিয়ে মিটার ডাউন করে নিল ইদু মিঞা, যাতে এয়ারপোর্ট থেকে যে নতুন প্যাসেঞ্জার উঠবে তার ঘাড়ে কিছু পয়সা আগে

থেকেই উঠে থাকে।

এয়ারপোর্ট পৌঁছে রানা দেখল কালো মার্সিডিস বেঞ্জটা নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে NO PARKING লেখা একটা সাইনবোর্ডের নিচে। এত চালাকি খাটল না দেখে ইদু মিঞার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চাপা গলায় বলল, 'হুজুর, নামলেই অ্যারেস করব আপনেরে। অখনও টাইম আছে। কন তো ভাইগা যাইগা।'

মনে মনে হাসল রানা। ইদু মিঞা তাকে হয় ক্রিমিন্যাল, নয় কমিউনিস্ট ঠাউরে নিয়েছে। মুখে বলল, 'না, তার দরকার নেই। ভাল গাড়ি চালাও তুমি, ইদু মিঞা।'

দু'জন পোর্টার এসে রানার সুটকেস নিয়ে গেল ওজন করে ট্যাগ লাগাতে। দুটো দশ টাকার নোট বের করে ইদু মিঞার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। আধ হাত জিভ বের করে কয়েকবার মাথা নাড়ল ইদু মিঞা।

'ট্যাকা দিয়া আমার ইজ্জতটা পাংচার কইরেন না, হুজুর। এর থেইকা দুইটা জুতার বাড়ি মাইরা যানগা।' আহত অভিমান ওর কণ্ঠে।

এই সূক্ষ্ম মান-অপমান জ্ঞান-সম্পন্ন ঢাকাইয়া কুট্টিকে আর বেশি না ঘাঁটিয়ে ব্রিফিং কাউন্টারের দিকে এগোল রানা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকের টেলিফোন-বুদের দরজাটা ফাঁক করে দেখল সেই সান গ্লাস পরা শ্রীমান ডায়াল ঘোরাচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে। মাল ওজন করিয়ে আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ এবং টিকেট দেখিয়ে সরু বোর্ডিং পাস নিল রানা।

'অ্যাটেনশন, ইওর অ্যাটেনশন প্লীজ। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্‌স অ্যানাউন্সেস্ দ্য ডিপারচার অভ ইট্‌স্ ফ্লাইট পি-কে ফাইভ টোয়েন্টি-ওয়ান টু ঈশ্বরদি। প্যাসেঞ্জারস্ অন বোর্ড প্লীজ। থ্যাঙ্ক ইয়ু।'

খনখনে মেয়েলী কণ্ঠস্বর।

প্লেনে উঠে একটা চেনা মুখও দেখতে পেল না রানা। খুশিই হলো মনে মনে। মাঝামাঝি জায়গায় জানালার ধারে বসে সীট বেল্ট বেঁধে নিল সে, তারপর খুলল রাহাত খানের দেয়া কাগজটা। শুধু একটা লাইন লেখা:

DON'T HESITATE TO KILL.

আকাশে উঠে গেল ফকার-ফ্রেণ্ডশিপ। হলুদ রোদ বিছিয়ে রয়েছে অনেক নিচে সবুজ মাঠের ওপর।

ছোট্ট শহর কুষ্টিয়া। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তৈরির পর মিউনিসিপ্যালিটি বোধহয় মানুষকে টিকা দিয়েই আর ফুরসত পাচ্ছে না—রাস্তার গায়ে যে স্থায়ী বসন্তের দাগ পড়ে গেছে, সেদিকে লক্ষই নেই। যানবাহনের মধ্যে রিকশাই একমাত্র ভরসা।

খোলা অবস্থায় চললে নির্ঘাত ছিটকে পড়বে রাস্তার ওপর, তাই হুড় তুলে দিয়ে চাঁদিতে খটাং-খটাং বাড়ি খেতে খেতে চলল রানা রিকশায় চেপে।

ডাকবাংলোতে সৌভাগ্যক্রমে একখানা ঘর খালি ছিল, পেয়ে গেল রানা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল অন্যান্য ঘরগুলোতে বিশ্রাম নিচ্ছে সকালের ট্রেনে যশোর থেকে আসা কলকাতার সাংস্কৃতিক মিশনের শিল্পীবৃন্দ।

স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নেবে মনে করে সুটকেস থেকে

কাপড়, টাওয়েল আর সাবান বের করে নিয়ে অ্যাটাচড্ বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে দেখল রানা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। একটু ধাক্কাধাক্কি করে বুঝল ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগানো। মিনিট পাঁচেক পরে খুট করে বল্টু খোলার শব্দ পাওয়া গেল। আরও দু'মিনিট পার হয়ে গেলেও যখন কেউ বেরিয়ে এল না, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে রানা গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। ওটা পাশাপাশি দুটো ঘরের কমোন বাথরুম। পাশের ঘরের ভদ্রলোক কাজ সেরে এদিকের বল্টু খুলে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছেন।

মিনিট দশেক শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করে পরিতৃপ্ত মাসুদ রানা গুনগুন করতে করতে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে, ওদিকের বল্টুটা খুলে দেয়ার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে।

ঠিক বিকেল পাঁচটায় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। দরজা খুলেই দেখল বিশ-বাইশ বছর বয়সের অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। মুখে এক-ফোঁটা মেকআপ নেই, শুধু কপালে একটা লাল কুমকুমের টিপ। খোলা এলোচুল। চোখ দুটো একটু ফোলা—এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে মনে হচ্ছে। পরনে হালকা নীল অর্গ্যাণ্ডির ওপর সাদা ছাপ দেয়া সাধারণ শাড়ি। সাংস্কৃতিক মিশনের কোন শিল্পী।

'ভেতরে আসুন,' বলল রানা।

'আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে আমি দুঃখিত,' পরিষ্কার বাংলায় বলল মেয়েটি। কথা ক'টা যেন নিক্তি দিয়ে ওজন করা। একটু ফ্যাসফেঁসে মেয়েটির কণ্ঠস্বর। যেন বেশ কিছুটা বাধা পেরিয়ে বেরোচ্ছে শব্দ। কিন্তু তীক্ষ্ণ, অদ্ভুত একটা মাদকতা আছে সে স্বরে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না তার। চোখে মুখে বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ।

এক সেকেণ্ডে রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। ও বলল, 'আর আপনাকে দুঃখিত অবস্থায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে আমি বিস্মিত, তারপর চিন্তিত এবং সবশেষে একান্ত লজ্জিত। এক্ষুণি আমি বল্টু খুলে দিচ্ছি বাথরুমের। আর এই জোড়হাত করে মাফ চাইছি—জীবনে আর কোনদিন এরকম কাজ করব না।'

হেসে ফেলল মেয়েটি। রানার ভণ্ডামি দেখে রাগ জল হয়ে গেল তার।

'বেশ লোক তো আপনি! ইচ্ছে করেই ছিটকিনি লাগিয়ে রেখেছিলেন নাকি?'

'না। সত্যি বলছি, ভুলে। ছি ছি ছি, দেখুন তো, আপনাকে কত অসুবিধের মধ্যে ফেললাম!' আন্তরিক লজ্জিত হলো রানা।

'আপনি কি করে বুঝলেন আমি পাশের ঘরেই আছি এবং এই কারণেই এসেছি?'

'দেখুন আমি নিতান্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ। ভয় পেলে কেন জানি আমার বুদ্ধি খুলে যায়। আপনার অমন মারমুখো মূর্তি দেখেই ভড়কে গিয়ে আমার মাথাটা খুলে গিয়েছিল। আর তাছাড়া—'

'মিত্রা!' একটা ভয়ানক গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

চমকে উঠে রানা দেখল একজন লোক এগিয়ে আসছে বারান্দা ধরে। সাড়ে

পাঁচ ফুট লম্বা। বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে—ঠিক কত বোঝা যায় না। পরনে শান্তিপুরী ধুতি আর খদ্দরের পাঞ্জাবী—কালো জহর কোট চাপানো তার ওপর। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, আর সারাটা মাথা জুড়ে চকচকে টাক। অদ্ভুত ফর্সা গায়ের রঙ। বড় বড় কানের ফুটো। দেহের সঙ্গে বেমানান প্রকাণ্ড গোল মাথাটা কাঁধের ওপর চেপে বসে আছে—ঘাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। আরেকটু কাছে আসতেই রানা লক্ষ করল পূর্ণিমার চাঁদের সমান গোল মুখটায় দাড়ি, গোঁফ, ভুরু, কিচ্ছু নেই—বোধহয় কোনদিন ওঠেইনি; কিংবা ঝরে পড়েছে Alopecia totalis রোগে। ছোট ছোট লম্বাটে হলুদ মঙ্গোলিয়ান চোখ দুটো নিষ্প্রভ, অভিব্যক্তিহীন। লালচে পুরু ঠোঁট দুটো ঘেন্না ধরায়। মুখের দুই কোণে ঘায়ের চিহ্ন। সবটা মিলিয়ে অদ্ভুত রকমের চেহারা লোকটার। এক নজরেই অপছন্দ করল রানা লোকটাকে। লোকটার চারপাশে একটা অশুভ ছায়া দেখতে পেল সে। বিপদ, ভয় আর অমঙ্গলের প্রতীক যেন লোকটা।

জিভ দিয়ে বাঁ-দিকের ঘা-টা ভিজিয়ে নিয়ে মিত্রার দিকে চেয়ে সে বলল, 'এখানে কি করছ মিত্রা, ঘরে যাও।'

বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা নিচু করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল মিত্রা। এবার রানার ওপর চোখ পড়ল লোকটির। ভয়ঙ্কর হলুদ দৃষ্টি মেলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে রানাকে। সাপের মত পলকহীন সে দৃষ্টি। অস্বস্তি বোধ করল রানা সেই ঠাণ্ডা দৃষ্টির সামনে। সাধারণ ভদ্রতার খাতিরে রানা বলল, 'আমার নাম···'

'তরিকুল ইসলাম। এ. পি. পি.-র ফটোগ্রাফার।' রানার বক্তব্য নিজেই বলে দিল লোকটা। 'আর আমার নাম জয়দ্রথ। জয়দ্রথ মৈত্র। এই শুভেচ্ছা মিশনের অধিকারী। পরে ভাল করে আলাপ হবে, মি. ইসলাম—এখন আমি একটু ব্যস্ত।'

ডান দিকের ঘা-টা চেটে নিয়ে ধীর পায়ে চলে গেল জয়দ্রথ মৈত্র। রানাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ যেন ভূতে ভর করেছিল ওর ওপর।

বাথরুমের দরজাটা খুলে দিয়ে একটা ইজি চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিল রানা। তারপর একটা খবরের কাগজ মেলে ধরল চোখের সামনে। জয়দ্রথ মৈত্রের চেহারাটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। তাহলে এ-ই হচ্ছে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সেই ভয়ঙ্কর H— যার সঙ্গে সংঘর্ষে বহু পাকিস্তানী দুঃসাহসী সিক্রেট এজেন্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অথচ একটি আঁচড়ও পড়েনি এর গায়ে। অদ্ভুত বুদ্ধিমান এবং কৌশলী এই H সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মেজর জেনারেল রাহাত খান পর্যন্ত সমীহ প্রকাশ না করে পারেন না। দুর্দান্ত এই ভয়ঙ্কর লোকটির পাশে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হলো রানার। মাথা ঝাঁকিয়ে এই ভাবটা দূর করবার চেষ্টা করল সে। মিত্রার কথা ভাবতে চেষ্টা করল। এই মেয়েটি কি শুধুই শিল্পী হিসেবে এসেছে, না এ-ও স্পাই? গানের শিল্পী, না নাচের? নাকি চেহারা ভাল বলে ধরে এনেছে—কোরাস গাইবে? অথবা অ্যানাউন্সারও হতে পারে। পুরো নামটা কি মেয়েটার? মিত্রা চৌধুরী? মিত্রা ব্যানার্জী? মিত্রা সেন গুপ্তা বা ঠাকুরতা। কিংবা নাগ, ভৌমিক, রায়, চক্রবর্তী, মুখোপাধ্যায়···

হঠাৎ একটু খুট আওয়াজ হতেই চোখ মেলে রানা দেখল হাসছে সোহেলের উজ্জ্বল দুই চোখ। এতদিন পর রানাকে পেয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত। কাঁধে একটা দেড় টাকা দামের ছোট্ট টাওয়েল। বয়-বেয়ারার সাদা ড্রেস পরা। কোমরের বেল্টে পিতলের মনোগ্রামে লেখা KUSHTIA REST HOUSE.

'কি নাম হে তোমার, ছোকরা?' খুব ভারিক্কি চালে জিজ্ঞেস করল রানা।

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধরে চোখ পাকিয়ে প্রথমে ঘুসি দেখাল সোহেল, তারপর বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে বলল, 'আজ্ঞে, রাখাল দাশ। "চার নম্বর" বলেও ডাকতে পারেন।' বুকে আঁটা নম্বর দেখাল সে।

'বেশ, বেশ। ঘরটায় চট করে ঝাড়ু লাগিয়ে দাও তো, বাবা রাখাল। বড় নোংরা হয়ে আছে।' চোখ টিপল রানা; ভাবটা—কেমন জব্দ!

সোহেল দেখল ওকে বেকায়দা অবস্থায় পেয়ে খুব এক হাত নিচ্ছে রানা। হেসে ফেলল সে। বলল, 'আজ্ঞে, এখন ঝাঁট দিলে ধুলোয় টিকতে পারবেন না। আপনি বাইরে যাবার সময় চাবিটা দিয়ে যাবেন, পরিষ্কার করে দেব সব নোংরা।'

'তাই দিয়ো। এখন চা-টা কি খাওয়াবে খাওয়াও দেখি জলদি। সন্ধের দিকে একটু বাইরে যাব ঘন্টা খানেকের জন্যে।'

ইঙ্গিতটা বুঝল সোহেল। বাইরে মানে সোহেলের বাংলো। হেড অফিসের সঙ্গে কথা আছে বোধহয়। নীরবে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

হাঁটার সময় সোহেলের ডান হাতটা দুলছে, বাঁ হাতটা স্থির হয়ে রয়েছে দেখে হঠাৎ তীব্র একটা বেদনা বোধ করল রানা। এক সময় রাহাত খানের সব চাইতে প্রিয়পাত্র ছিল ওরা দু'জন। বক্সিং, যুযুৎসু, পিস্তল ছোঁড়া, শক্তি, বুদ্ধি, সাহস, সব ব্যাপারেই দু'জন কেউ কারও চেয়ে কম যেত না। নিজেদের মধ্যে যেমন ছিল ওদের তীব্র প্রতিযোগিতা, তেমনি ছিল গভীর বন্ধুত্ব। কিন্তু ভাগ্য সোহেলের বিরূপ। একবার একটা অ্যাসাইনমেন্ট-এ চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পাথরে পা পিছলে টাল সামলাতে না পেরে চাকার তলায় কাটা পড়ল বাম হাত। একেবারে ছাঁটাই না করে বিপজ্জনক কাজ থেকে সরিয়ে ওকে যশোর-কুষ্টিয়া ব্রাঞ্চের হেড করে দিয়েছেন রাহাত খান। কে জানে, হয়তো রানারও একদিন এমনি অবস্থা হবে। নিজের অজান্তেই ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক চিরে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্রে-তে করে এক পট চা আর কিছু বিস্কিট নিয়ে ফিরে এল সোহেল। রানার পাশে টিপয়টা টেনে দিয়ে সেগুলো নামিয়ে রাখতে রাখতে চাপা গলায় বলল, 'তোকে চিনে ফেলেছে ওরা, রানা। আমার যদ্দূর বিশ্বাস জেনে গেছে ওরা তোর পরিচয়। জয়দ্রথ মৈত্রের কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে ওদের দলের একজন প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাইকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে খুব সম্ভব। আমি এখনও ওদের সন্দেহের বাইরে আছি। হিন্দু বলে বিশেষ ফেভারও পাচ্ছি।'একটা চাবি বের করল সোহেল পকেট থেকে। 'এই নে, আমার ওয়্যারলেস রুমের চাবি। আমি সন্ধের সময় বেরোতে পারব না। তুই সোজা রেল-স্টেশনে চলে যাবি। ওখান থেকে আমার লোক তোকে নিয়ে যাবে আমার বাড়িতে। রাতে আমি নজর রাখব, আর হঠাৎ যদি দরকার মনে করিস, এই বেল টিপে দিস। আজই সকালে লাগিয়েছি।' খাটের পায়ায় লাগানো গোপন কলিং বেলের সুইচ দেখিয়ে দিল

সোহেল।

'বেশ জমিয়ে নিয়েছিস দেখছি, দোস্ত!' সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইল রানা ওর দিকে। কিন্তু সেই সঙ্গে জুড়ে দিল, 'দেখিস, ভুলে যাস নে আবার, আমি বেরিয়ে গেলেই ঘরটায় একহাত ঝাড়ু লাগিয়ে দিস, বাবা!' চোখে মুখে দুষ্টামি হাসি রানার।

'যা-যা, বাজে বকিস না। ফাই-ফরমাস খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে। পিঠটা ব্যাকা হয়ে গেছে আমার। ঘর ঝাড়ু দেব না, শালা ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দেব।'

বেরিয়ে গেল সোহেল। আবার রানার চোখে পড়ল, বাম হাতটা স্থির হয়ে ঝুলছে সোহেলের। কিন্তু দমে যায়নি সোহেল। তেমনি হাসিখুশি চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দুই চোখ। হার মানেনি সে ভাগ্যের কাছে।

সেই রাতে মিত্রা সেন সত্যিই মুগ্ধ করল রানাকে। নৃত্যকলাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি দিল সে এই প্রথম। কিন্তু নাচের শেষে অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হলো রানাকে। পরিষ্কার ঘৃণা প্রকাশ পেল মিত্রার ব্যবহারে। আহত রানা বুঝল, সত্যিই ধরা পড়ে গেছে সে। ঢাকা এয়ারপোর্টের সেই সানগ্লাস পরা ছোকরাকে অবজ্ঞা করা তার উচিত হয়নি।

চার

২৯ আগস্ট, ১৯৬৫

অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক বিড়ালের মত চোখ মেলে চাইল রানা। ঘুমের লেশমাত্র নেই সে চোখে। যেন জেগেই ছিল এতক্ষণ। আবছা একটা ধস্তাধস্তির শব্দ এল কানে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল রানা বিছানার ওপর। আন্দাজে বুঝল শব্দটা আসছে মিত্রা সেনের ঘর থেকে।

নিঃশব্দে বাথরুমের ছিটকিনি খুলে পা টিপে মিত্রার ঘরের দিকের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মৃদু আলো আসছে মিত্রার ঘর থেকে। একটা ফুটোয় চোখ রেখেই তাজ্জব হয়ে গেল সে। চোখটা একবার কচলে নিয়ে আবার রাখল ফুটোতে। সেই একই দৃশ্য। টেবিল্‌ ল্যাম্পটা মাথা নিচু করে জ্বালানো আছে টেবিলের ওপর। সেই আলোয় দেখা গেল চারজন গুণ্ডা মার্কা মুখোশধারী লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে মিত্রা সেন। মুখে রুমাল পুরে চিৎকারের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে আগেই। এবার দু'হাত পেছনে নিয়ে দুই কনুই একসঙ্গে টেনে বেঁধে ফেলা হলো। আঁচল খসে পড়ে শাড়িটা লুটোপুটি খাচ্ছে মাটিতে। কিন্তু সমানে পা চালাচ্ছে মিত্রা। সামনের লোকটার তলপেট বরাবর ঝেড়ে একটা লাথি মারল সে। দু'পা পিছিয়ে গেল লোকটা। হঠাৎ পাশ থেকে একজন লোক এগিয়ে এসে চোখা ছুরিটা মারাত্মক ভঙ্গিতে বুকে ঠেসে ধরে নিচু গলায় কানের কাছে কিছু বলল। স্থির হয়ে গেল মিত্রা সেন। আর বাধা দেবার চেষ্টা করল না। চোখ দুটো ভয়ে বিস্ফারিত। নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে জল গড়িয়ে পড়ল ওর চোখ থেকে।

ছিটকিনির অবস্থান আন্দাজ করে নিয়ে জোরে একটা লাথি মারল রানা

বাথরুমের দরজায়। খুলে গেল কপাট। কেউ কিছু বুঝবার আগেই সামনের দু'জন লোক ধরাশায়ী হলো রানার প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে। তৃতীয়জন ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। প্রথমে ছোরাসুদ্ধ হাতটা ধরে ফেলল রানা, তারপর যুযুৎসুর এক প্যাঁচে আছড়ে ফেলল মাটিতে। এবার দুই হাঁটু জড়ো করে ঝপাং করে পড়ল ওর পেটের ওপর। 'হুঁক' করে একটা আওয়াজ বেরোল ওর মুখ দিয়ে; নড়বার আর শক্তি রইল না। কিন্তু রানা উঠে দাঁড়াবার আগেই প্রথম আক্রান্ত একজন উঠে এসে পেছন থেকে সাপটে ধরল রানাকে। চতুর্থ লোকটি এবার কোমর থেকে টান দিয়ে একটা থ্রোইং নাইফ বের করল। মুখে বিজয়ীর হাসি।

'আব কাঁহা যাওগে, উল্লুকে পাটঠে!'

রানার বুক বরাবর ছুরিটা ছুঁড়তে গিয়ে থমকে গেল সে। যেন যাদুমন্ত্রের বলে পেছনের লোকটা রানার সামনে চলে এসেছে। একটু হলেই সেমসাইড হয়ে যেত। মাজার ওপর রানার প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে লোকটা গিয়ে পড়ল চতুর্থ জনের ওপর। টাল সামলাতে গিয়ে ছুরিটা পড়ে গেল হাত থেকে মাটিতে। আর মাটিতে পড়তেই পা দিয়ে এক ঠেলা দিয়ে মিত্রা সেটাকে পাঠিয়ে দিল ঘরের এক কোণে। খালি হাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ভীষণ আকৃতির চতুর্থ লোকটা রানার ওপর। নাক বরাবর রানার গোটা দুই নক্-আউট পাঞ্চ খেয়ে সে ছিটকে পড়ল জানালার ধারে।

রানা চেয়ে দেখল জানালার সবক'টা শিক বাঁকানো। এই পথেই প্রবেশ করেছে লোকগুলো। বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে কখন সে টেরই পায়নি। কি করবে ভাবছে রানা, এমন সময় বাইরের অন্ধকার থেকে মস্ত একখানা ঢিল ছুটে এসে খটাশ করে লাগল ওর কপালে। আঁধার হয়ে গেল রানার চোখ। পড়ে যাচ্ছিল, চেয়ারের হাতল ধরে সামলে নিল। মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে ফেললে চলবে না। এখন জ্ঞান হারালে নিশ্চিত মৃত্যু।

যেন বহুদূর থেকে কয়েকটা কথা কানে এল রানার।

'সালা ডাকু হ্যায়। ভাগো! ভাগো সাবলোক ইয়াহাঁসে!'

সেকেণ্ড চারেক পাঁজর বরাবর একটা ছুরির আঘাত এবং তীব্র বেদনা আশা করল রানা। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। তখনও ঘুরছে মাথা। চেয়ে দেখল চারজন মুখোশধারীই অদৃশ্য হয়ে গেছে। মিত্রা ছাড়া ঘরে কেউ নেই। ছুটে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বৃষ্টির ছাঁট লাগল চোখে মুখে। একটু পরেই দেখল বড় রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি সোজা উত্তর দিকে চলে গেল সামনের অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত করে। মিত্রাও পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'চলে গেল?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

ঘরের এক কোণ থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে মিত্রা সেনের হাতের বাঁধন কেটে দিল রানা। তখনও থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা। রানা বলল, 'আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন, আমি আপনার জন্যে একটু ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আসছি।' বাথরুমের মধ্যে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল রানা।

সুটকেস থেকে বোতল বের করে আধ গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিয়ে পাশের ঘরে এল

রানা। দেখল বিছানার ওপর বসে আছে মিত্রা সেন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

'ঢুক করে এটুকু খেয়ে ফেলুন, আমি মৈত্র মশাইকে ডেকে আনছি।'

চট করে একবার রানার চোখের দিকে চেয়ে নিল মিত্রা সেন। তারপর গ্লাসটা নিয়ে একহাতে নাক টিপে ধরে তিন ঢোকে খেয়ে ফেলল ব্র্যাণ্ডিটুকু। রানা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কি মনে করে মিত্রা ডাকল, 'শুনুন।'

'কি।'

'মৈত্র মশায়কে ডাকা যাবে পরে। এখন এই চেয়ারটায় বসুন তো, কপালটা অসম্ভব ফুলে গেছে, জলপট্টি লাগিয়ে দিই। তাছাড়া, মৈত্র মশাই এসে এখন আহা-উহু ছাড়া আর কি করবেন?'

একটা রুমাল চার ভাঁজ করে এক মগ পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফোলা জায়গাটায় ধরল মিত্রা, তারপর ভেজা রুমালটা কপালে বসিয়ে আরেকটা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল রানার মাথাটা।

'মৈত্র মশায়কে ডাকার কোন দরকার নেই। বিপদগ্রস্তা ভদ্রমহিলার জন্যে নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ফটোগ্রাফারের কাছাকাছি থাকাই বেশি নিরাপদ।'

'ভাবছি, এই লোকগুলো কে। আপনি চেনেন এদের? আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল কোথায়?'

'আমি কিচ্ছু জানি না। কোনদিন এদের দেখিনি।'

'সাধারণ গুণ্ডা বলেই তো মনে হলো। কিন্তু কোন আভাসই পাননি আপনি, এ কেমন কথা?'

'এমনি কানাঘুষোয় শুনেছি, একটা বদমাইশের দল আছে, ইয়ং টাইগারস্ না কি একটা নাম—ওরা নাকি লোক লাগিয়েছে, সুযোগ পেলেই আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ওদের আড্ডায়। তেমন কোন গুরুত্ব দিইনি এসব কথার।'

ইয়ং টাইগারস্-এর নাম শুনে একটু কঠিন হয়ে গেল রানার মুখ। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল, 'আপনার দলের কাউকে যদি ডাকতে বলেন তো ডেকে দিতে পারি। আর নইলে আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আমার ঘরে যাই। রাত এখনও অনেক বাকি আছে, এভাবে গল্প করলে কাটবে না।'

উঠে দাঁড়াল রানা। তখনও ঝমঝম অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। কাছেই কোন পুকুরে ব্যাঙ ডাকছে ক্যাঁ-কোঁ, ক্যাঁ-কোঁ একঘেয়ে সুরে। বিজলী চমকে উঠল আকাশ চিরে।

মিত্রাও উঠে দাঁড়াল।

'কেমন লোক আপনি? এই ঘরে একা আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছেন যে বড়। একা কি করে থাকব আমি এই জানালা ভাঙা ঘরে?'

একটু ভেবে নিয়ে রানা বলল, 'বেশ তো, আপনি আমার বিছানায় গিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন। আমি না হয় এই ঘরে আপনার পাহারায় থাকব।'

'আমার এমনিতেই আজ রাতে আর ঘুম আসবে না। আসুন না, আপনার ঘরে বসে গল্প করে কাটিয়ে দিই রাতটা?'

'না। আপনার ঘুম না এলেও আমার ঘুম আসবে।' ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'আপনি আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

'কারণ? অনুষ্ঠানের শেষে দুর্ব্যবহার করেছিলাম, তাই?'

'না।' মিত্রার চোখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইল রানা। 'সেজন্যে নয়। কারণটা খুবই সাধারণ। মানুষে খারাপ বলে···সব দোষ পড়ে মেয়েদের ঘাড়ে।'

মন দিয়ে কথাগুলো শুনল মিত্রা। বুঝল কথাটা বিশ্রী হলেও সত্য। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর। তারপর হঠাৎ ঘুরে চলে গেল রানার ঘরে।

এক মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এল মিত্রা। হাতে রানার ওয়ালথার পি.পি.কে. পিস্তল।

'এই নিরীহ, শান্তিপ্রিয় বস্তুটি বালিসের তলায় থাকলে অস্বস্তি লাগছে। জিনিসটা আপনার কাছেই থাক—কোন কাজে লেগে যেতে পারে।'

ঘন্টা দেড়েক পার হয়ে গেল। বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে উসখুস করছে রানা। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। বালিশে মিত্রার চুলের সুবাস। বৃষ্টি থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ, তাই দ্বিগুণ জোরে শোনা যাচ্ছে ব্যাঙের ডাক। জানালার বাইরে টিপ টিপ জোনাকির দীপ জ্বলছে, এখনও পুরোদস্তুর শহর হয়ে উঠতে পারেনি জায়গাটা।

বাথরুম চেপেছে কিছুক্ষণ ধরে। লাইট জ্বালাবার ঠিক আগের মুহূর্তে দেখতে পেল সে আবছা একটা লম্বা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ঘরের মাঝখানে। হাতের পিস্তলটা ওর দিকে ফেরানো। চমকে উঠল রানা।

'একটু নড়াচড়া করলেই খুলি ফুটো করে দেব,' মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

মরার মত কাঠ হয়ে পড়ে থাকল রানা। অসতর্ক থাকার জন্যে ভয়ানক রাগ হলো নিজের ওপর। একবার ভাবল বালিশের তলায় পিস্তলটার কথা। কিন্তু এখন চেষ্টা করা বৃথা। দেখা যাক কি হয়।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমার যম!' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল লোকটা। পিস্তলটা তেমনি ধরা। টেবিল ল্যাম্পটা জেলে দিল সে। লোকটার চেহারা দেখেই অবাক হয়ে উঠে বসল রানা বিছানার ওপর।

'তুই! তুই শালা এত রাতে এ ঘরে ঢুকেছিস কেন?'

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত সোহেলের মুখ।

'দিয়েছিলাম তো ঘাবড়ে, বোক্-চন্দর! টেরও পেলি নে জলজ্যান্ত মানুষটা ঢুকলাম ঘরের ভেতর! কালই শালা তোর চাকরি খেয়ে দেব আমি দেখিস বুড়োকে বলে।'

ওর একান্ত প্রিয় নাইন মিলিমিটার হ্যামার লেস ল্যুগার পিস্তলটা প্যান্টের নিচে তলপেটের কাছে লুকোনো হোলস্টারে ঢুকিয়ে দিল সোহেল।

'আরে যা যা! তোর মত দশটা বয় বেয়ারা আমার এক ডাকে ছুটে আসে, তা জানিস? তুই আমার কচু করতে পারবি। আর একটু হলে যেই হার্টফেলটা করতাম—বারোটা বেজে যেত তোর। কিন্তু দোস্ত, মনে হচ্ছে আজ রাতের সব ঘটনাই তোর জানা?'

'স-অব, স-অব! সব দেখেছি তো আমি। আহাহা! তোর কপালে যখন জলপট্টি লাগাচ্ছিল না, উহ্!' জিভ দিয়ে একটা বিশেষ শব্দ বের করল সোহেল। 'তখন

আমার কি ইচ্ছে করছিল জানিস? মনে হচ্ছিল নিজের কপালে নিজেই একটা ইট মেরে গিয়ে হাজির হই সামনে।'

হাসল রানা। হাতল-বিহীন একটা চেয়ারে উল্টো হয়ে বসল সোহেল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ বলল, 'আমার কথা হেড অফিসের সবাই ভুলে গেছে, নারে? কেউ আমার কথা কিছু বলে না?' কেমন যেন একটা হাহাকার, একটা করুণ সুর ধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠে।

'বলবে না কেন? সবাই বলে।' মিথ্যে কথা বলল রানা। নিত্যনতুন কাজের চাপে অতীতকে মনে রাখবার উপায় আছে? সে নিজেই তো প্রায় ভুলতে বসেছিল। তবু বলল, 'কেন, তোর ওই সিঙ্গাপুর অ্যাসাইনমেন্ট-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে সেদিন মেজর জেনারেল তো মস্ত এক লেকচারই ঝেড়ে বসল আমাদের ওপর।'

কেন জানি কথাটা অকপটে বিশ্বাস করল সোহেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল ওর। বলল, 'কী দিন ছিল, তাই না রে!' তারপর হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। কাছে এসে এক টানে রানার পট্টি খুলে দিল।

'ন্যাকামি হচ্ছে, না? মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে একবারে সিনেমার হিরো! অ্যাঁ? মুখটা ওপরে তোল, শালা!'

কপালের আঘাতটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল সোহেল। তারপর পকেট থেকে বের করল একটা মলমের কৌটো। কৌটোর নিচের দিকটা শক্ত করে চেপে ধরে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। ঢাকনিটা খুলে দিল রানা। কালো মত ওষুধ।

'কি ওষুধ রে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আইয়োডেক্স। ডাক-বাংলোর ফার্স্ট-এইড বক্সে পেলাম। শিশিটা ভেঙে গেছে বলে বোধহয় এই কৌটোয় তুলে রেখেছে লেবেল লাগিয়ে।'

রানার কপালে লাগিয়ে দিল সোহেল মলমটা। তারপর আঙুল দুটো নিশ্চিন্ত মনে রানার পরিষ্কার শার্টে মুছে নিয়ে পকেট থেকে গোটা দুই নোভালজিন ট্যাবলেট বের করে দিল।

'এ দুটো মেরে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়। সাড়ে তিনটে বাজছে। আমি বাকি রাতটুকু পাহারা দেব।'

'বেশ। অতি উত্তম প্রস্তাব। আর সকালে গোটা আষ্টেক ডিম পোচ, ছ'স্লাইস বাটার টোস্ট, চারটে অমৃত সাগর কলা আর ফাস ক্লাস করে এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আসবি বেল বাজানো মাত্র। নইলে ম্যানেজারকে বলে তোর কান...'

কানটাকে কি করা হবে হাতের ইঙ্গিতে দেখাল রানা। মৃদু হাসল সোহেল। তারপর রানার ওষুধ খাওয়া শেষ হয়ে গেলে জানালা গলে বেরিয়ে গেল জোনাক-জ্বলা রাতের অন্ধকারে।

পাঁচ

২৯ আগস্ট, ১৯৬৫

সকালে প্রবল করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙল রানার। দরজা খুলে দেখল সামনে

দাঁড়িয়ে জয়দ্রথ মৈত্র। ভূত দেখার মত চমকে উঠল জয়দ্রথ ও রানা একসঙ্গে। হলুদ দৃষ্টি রানার চোখের ওপর স্থির হয়ে গেল। ডান দিকের ঘা-টা চাটল মৈত্র।

'আপনি এ ঘরে কেন?' দৃষ্টিটা রানার চোখ থেকে সরে সারা ঘরে একবার ঘুরে জানালার ওপর থমকে দাঁড়াল, তারপর আবার স্থির হলো এসে রানার মুখে। ঠিক এমনি সময় মিত্রা এসে ঘরে ঢুকল বাথরুমের দরজা দিয়ে। জয়দ্রথের চোখে কুৎসিত একটা সন্দেহের ছায়া দেখতে পেল মিত্রা। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইল ওর।

গম্ভীর মুখে সব শুনল জয়দ্রথ মৈত্র। কতটুকু বিশ্বাস করল আর কতটুকু ইচ্ছেমত যোগবিয়োগ করে নিল কে জানে। সবশেষে রানার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ, মি. তরিকুল ইসলাম। আপনার সাহায্যের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' ঘুরে দাঁড়িয়ে মিত্রাকে বলল, 'রাতেই আমাকে জানানো উচিত ছিল তোমার।' ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে একটু থেমে পেছনে না ফিরেই বলল, 'আমার ঘরে একটু শুনে যেয়ো, মিত্রা,' তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'তোমাদের সব ধরে ধরে ইয়ে করা দরকার। বুঝছ? এটা কি চা হয়েছে, না কানা চোখের পানি?' সোহেলের হাতে ট্রের ওপর চায়ের কাপের দিকে চেয়েই গর্জে উঠল মাসুদ রানা।

নাস্তার এঁটো তস্তরি-বাসন তুলতে তুলতে নিচু গলায় সোহেল বলল, 'নে, ইয়ার্কি রাখ্। আজ দুপুরে ওরা সব চলল শিলাইদহ দেখতে। তুই যাবি নাকি?'

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, 'আমাকে ওরা চিনে ফেলেছে বলছিলি না কাল তুই?'

'হ্যাঁ।'

'আর তোকে? তোর ওপর কোন সন্দেহ হয়নি তো ওদের?'

'না। এখনও হয়নি।'

'তাহলে আমি যাব শিলাইদহে।'

'সন্দেহের সঙ্গে শিলাইদহের কি সম্পর্ক?' অবাক হলো সোহেল।

'সম্পর্ক আছে। শোন্, বলছি। আমি ওদের সঙ্গে যদি শিলাইদহে যাই তবে ওরা এদিকটায় এত কড়া পাহারা দেবে না। পাঁচ নম্বর রূমে ওদের কি আছে আমার জানা দরকার। কিন্তু সব সময় ওদের লোক ঘরটার ওপর এত কড়া পাহারা রাখে যে কোন রকমে ভিড়তেই পারছি না কাছে। তুই যখন বলছিস তোর ওপর ওদের কোন সন্দেহ নেই, যত সন্দেহ এই আমার ওপর, তখন আমি ওদের সঙ্গে শিলাইদহ গেলে ওই ঘরটার ব্যাপারে ওরা কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকবে। আর সেই সুযোগে তুই ঢুকবি ওই ঘরে, দেখে আসবি কি চলছে গোপনে ওই নিষিদ্ধ ঘরে। কি বলিস, পারবি না?'

'যো হুকুম, ওস্তাদ।'

সেদিন, অর্থাৎ ২৯ আগস্ট দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই দল বেঁধে বেরোল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহ কুঠি দেখতে। রানাও গেল। মিত্রাও। কিন্তু মিত্রা যেন সেই গতরাতের সহজ সাবলীল মিত্রাই নয়। সারা মুখে থমথমে গাম্ভীর্য। চোখ দুটো

কেমন উদভ্রান্ত। রানার সঙ্গে একটি বাক্য বিনিময়ও যেন না হয় সেদিকে কেবল জয়দ্রথই নয়, দলের প্রত্যেকটি লোক এবং স্ত্রীলোক সতর্ক দৃষ্টি রাখল। মিত্রার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হলো না। শুধু এটুকু লক্ষ করল রানা, গভীর চিন্তামগ্ন মিত্রা সেন থেকে থেকে ওর দিকে চাইছে দূর থেকে। ও চাইলেই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অন্য দিকে। অনেক চিন্তা করেও যেন কিছু একটা কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না মিত্রা।

নক্ষঘাটে নেমে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। হাতের বাঁয়ে পড়ল রবীন্দ্রনাথের পোস্টাপিস বা ডাকঘর। এখানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কও নাকি স্থাপন করেছিলেন তিনি। আরও কিছুদূর এগিয়ে দূর থেকে দোতলা কাছারি বাড়ি দেখা গেল, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে ডান দিকে মোড় ঘুরল ওরা। কুঠি বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে বিরাট আম বাগান, বাঁয়ে কিছু খেত ও ঝাউয়ের বন। সোজা এগিয়ে দেখা গেল সুন্দর বাংলো টাইপ পাকা দোতলা বাড়ি—ওপরটা টালি দেয়া। ফুলের বাগান ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই হলঘর। পাল্কিটা সত্যিই দেখবার মত। অল্পস্বল্প আসবাবপত্র আছে—কয়েকটা আলমারিতে কিছু বই। দোতলার ঘর আর ছাতের চিলে কোঠা দেখে দলবল এগিয়ে গেল আঙিনায় আম বাগানের সেই বিখ্যাত চাতাল দেখতে। হঠাৎ এদের সঙ্গ কেন জানি বড় তিক্ত লাগল রানার কাছে। পিছিয়ে পড়ল সে। বেরিয়ে এল বাইরে। ফুলের বাগান বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গেল পুকুরের দিকে। ডানধারে চাকরদের একতলা লম্বা ঘর। ঘাটের দু'ধারে মস্ত দুটো বকুল গাছ। বিকেল বেলাতেই চারদিকটা নিঝুম হয়ে এসেছে। পুকুরে স্নানার্থী নেই আর।

শান বাঁধানো পুকুর ঘাটে চুপচাপ বসল গিয়ে রানা। একা। ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে নিল কাপে।

অদ্ভুত সুন্দর বিকেল। শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশের সাদা মেঘগুলো ছায়া ফেলেছে কানায় কানায় ভরা পুকুরটার কালো জলে। মৃদু বাতাসে ঝির ঝির করছে ঝাউয়ের পাতা। চারদিকে স্নিগ্ধ, শান্ত, সমাহিত একটা ভাব।

বি. এ. ক্লাসে পড়া রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার ক'টা লাইন মনে পড়ল রানার:

'কাছে এলো পূজার ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপা ফুলের রঙ।
হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে সাদা মেঘের আলস্য—
দেখে, মন লাগে না কাজে ॥'

সেই মুহূর্তে ভুলে গেল রানা তার কাজের কথা, জয়দ্রথ মৈত্রের কথা, মিত্রার কথা। শহরের কর্মমুখর জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এসে এক অদ্ভুত পরিপূর্ণতাকে উপলব্ধি করল সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। অদ্ভুত। অদ্ভুত এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে এই জগৎ জুড়ে।

পৃথিবীটা সত্যিই মায়াবী এক স্বপ্নের দেশ!

*

দুপুরে ডাকবাংলোটা নিঝুম হয়ে গেল। দু'জন ছাড়া সাংস্কৃতিক মিশনের বাকি সবাই চলে গেছে শিলাইদহ দেখতে, রানা গেছে সঙ্গে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল সোহেল একজন বিছানায় শুয়ে এবং অপর জন বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে 'হানিমুন ব্রিজ' খেলছে। চেয়ারে বসা লোকটার হাতে একটা অনার্স কার্ডও নেই—কিন্তু হাঁক ছাড়ল: ফোর নো ট্রাম্পস।

আস্তে ঘরের শিকলটা তুলে দিল সোহেল বাইরে থেকে। তারপর এক গোছা চাবি হাতে নিয়ে দাঁড়াল সেই নিষিদ্ধ ঘরটার সামনে। কয়েকটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করার পর একটা চাবি লেগে গেল তালায়।

বেশ বড় ঘর। একটা আলমারি আর ছোট একটা টেবিলের দু'ধারে দুটো চেয়ার ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। ঘরের মধ্যে এলোমেলো করে ছড়ানো স্টেজ ডেকোরেশনের সাজ সরঞ্জাম। কিন্তু বাক্সগুলো কিসের?

প্রকাণ্ড সাইজের তিনটে বাক্স ক্যানভাসের তেরপল দিয়ে ঢাকা। তেরপল উঠিয়ে ডালা খুলল সোহেল। বড় সাইজের বেলের মত গোল সবুজ পেইন্ট করা অসংখ্য বল। বোম-টোম নাকি? তিনটের বাক্সেই একই জিনিস। হাতে তুলে নিল একটা। বেশ ভারি। টোকা দিয়ে দেখল ওপরটা প্লাস্টিকের।

সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও উল্লেখযোগ্য আর কিছুই পাওয়া গেল না। একটা বল হাতে বেরিয়ে এল সোহেল ঘর থেকে। বলটা দুই উরুতে চেপে ধরে তালা লাগিয়ে দিল আবার দরজায়।

জানতেও পারল না সে, আলমারির মাথায় নিখুঁত ভাবে লুকোনো একখানা সিক্সটিন মিলিমিটার মুভি ক্যামেরায় তার সমস্ত গোপন কার্যকলাপের ছবি উঠে গেল।

জয়দ্রথের মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলল তার মাথার ওপর।

রাত তখন সাড়ে-বারোটা হবে। রানা শুয়ে আছে বিছানায়। ঘুম আসছে না কিছুতেই। আজ কুষ্টিয়ায় শেষ হয়ে গেল অনুষ্ঠান। আবার পাততাড়ি গুটিয়ে ভোর রাতের ট্রেনে রওনা হতে হবে রাজশাহীর পথে। পাশের ঘরে মিত্রা নেই। ওকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে অন্য ঘরে।

ইয়ং টাইগারস্-এর দলটাকে সোহেল চিনিয়ে দিয়েছে দূর থেকে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আজকের রিপোর্ট পেয়ে রাহাত খান কেমন চমকে উঠবে ভাবতে ভাল লাগল রানার। স্যাম্পলটা রানার কাছেই আছে, ঈশ্বরদি পৌঁছে প্লেনে করে পাঠিয়ে দেয়া হবে ঢাকায়, হেড অফিসে। এতদিন পর একটা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে সোহেল। আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু ওর জন্যে মনে মনে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছে না রানা। কথায় কথায় সোহেল বলেছে: আমি ধরা পড়ে গেছি রানা। ওদের ব্যবহারেই টের পেয়েছি, আমার পরিচয় ওদের কাছে আর গোপন নেই। অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই, আজই তো শালারা ভাগছে এখান থেকে—আমার ডিউটিও এখানেই শেষ।' কিন্তু রানা জানে সহজে ছাড়বার পাত্র জয়দ্রথ মৈত্র নয়।

ঠিক এমনি সময়ে গগনভেদী এক অপার্থিব চিৎকারে কেঁপে উঠল রাত্রির নিস্তব্ধতা। সোহেল না তো! একলাফে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল রানা। ঠিক

দশগজ দূরে আধো-অন্ধকারে ঘাসের ওপর পড়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে একজন লোক। পিঠের ওপর আমূল বিঁধে আছে একটা ছোরা। লোকটার হাতেও একখানা ছুরি ধরা। সোহেলের মতই লাগছে না অনেকটা? আরে ওই তো! দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে একটা মূর্তি। মাথায় খুন চেপে গেল রানার। একটানে পিস্তল বের করল সে হোলস্টার থেকে। এখনও রেঞ্জের বাইরে যায়নি আততায়ী।

ট্রিগারে আঙুল চেপে গুলি করবার ঠিক আগের মুহূর্তে থেমে গেল রানা। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখল দৌড়াবার সময় আততায়ীর একটা হাত দুলছে—আরেকটা হাত স্থির হয়ে ঝুলছে কাঁধ থেকে।

নিঃশব্দে জানালা থেকে সরে এল রানা।

বাইরে চিৎকার শুনে ছুটে আসা লোকজনের উচ্চকণ্ঠে আলাপ-আলোচনা নির্লিপ্ত ভাবে শুনতে শুনতে একসময় গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল সে।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। গার্ডের বাঁশি। হুইসল্ দিয়ে ছেড়ে দিল লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পোড়াদা-ভেড়ামারা-ঈশ্বরদি-আবদুলপুর-সারদা-রাজশাহী। পঁচাত্তর মাইল।

রানা উঠে পড়ল সেকেণ্ড ক্লাস একটা কম্পার্টমেন্টে। সাংস্কৃতিক মিশনের রিজার্ভ করা সব শেষের দুই কামরার বগিতে কিছুতেই উঠতে দিল না ওকে জয়দ্রথ মৈত্র। কাজেই যতখানি সম্ভব কাজের একটা কামরায় উঠতে হলো রানাকে। রানা লক্ষ করল সবশেষের কামরায় উঠেছে বাক্স তিনটে।

ব্রডগেজ লাইনে হু-হু করে স্পীড বেড়ে গেল ট্রেনের। চার সীটের কামরা। দু'জন প্যাসেঞ্জার নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে বাঙ্কের ওপর। আর যে লোকটা অনেক ধাক্কাধাক্কির পর বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল, সে এখনও পাশের সীটের ওপর পা চড়িয়ে দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে ঢুলছে। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে শেষের কামরার দিকে চাইল রানা।

পার্টিশন কিসের? রানা দেখল শেষ বগির দরজা দিয়ে স্টেজ ডেকোরেশনের একটা ক্যানভাস-পার্টিশন বেরিয়ে আছে বাইরে। ব্যাপার কি? ওপাশের দরজা দিয়ে মাথা বের করে দেখল ওদিকেও ঠিক তাই। ফলে শেষের কামরাটা পুরো ট্রেন থেকে আড়াল হয়ে গেছে। কি চলছে শেষ কামরায়? এখান থেকে বোঝার উপায় নেই।

আট মাইল পেরিয়ে এসে পোড়াদহ স্টেশনে থামল ট্রেন। প্রায় লাফিয়ে নেমে এল রানা। দেখল পার্টিশনটা আর নেই। শেষ দুই কামরার পাশ দিয়ে এক চক্কর ঘুরে এল মাসুদ রানা। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না তার। এদিকে হুইসল্ দিয়ে ছেড়ে দিল ট্রেন। প্রাণপণ দৌড়ে কোন রকমে বাদুড় ঝোলা হয়ে উঠল গিয়ে নিজের কামরায়।

ভোর হয়ে আসছে। পুবের আকাশটা বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। হালকা কুয়াশায় আচ্ছন্ন ফসল ভরা আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। আউশ ধান। মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কুঁড়ে ঘর, উঠানে খড়ের গাদা, আম কাঁঠাল আর কলা গাছ; মেঠেলের ধারে বাঁশের ঝাড়।

আবার জানালা দিয়ে পার্টিশন দেখতে পেল রানা।

সুটকেস থেকে একটা নাইলন কর্ড বের করল সে। কামরার কেউ জাগেনি এখনও। আধ-শোয়া লোকটার মুখ থেকে লালা ঝরছে গেঞ্জির ওপর।

কামরায় উঠবার সুবিধের জন্যে যে লোহার হাতলটা থাকে তার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল রানা দড়ির এক প্রান্ত। ভারি দরজাটা খুলে হাঁ করে দিল। এবার খোলা দরজার ধারে বাইরের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। একবার ভাবল, তার দেহের ওজন সহ্য করতে পারবে তো কর্ডটা? পারবে। হাঁটু সোজা রেখে রশিটা ধরে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। মাটি থেকে সমান্তরাল ভাবে রয়েছে ওর দেহ। হু হু বাতাস আর সেই সঙ্গে প্রচুর ধূলিকণায় শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো। ডান চোখের ভিতর বুলেটের বেগে একটা কাঁকর এসে পড়ল। বেশিক্ষণ এই ভাবে থাকা সম্ভব নয়। যে কোন মুহূর্তে গাছের গুঁড়িতে কিংবা কোন খুঁটিতে লেগে ছাতু হয়ে যেতে পারে মাথাটা।

ডান চোখ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাঁ চোখ মেলে রানা দেখল পার্টিশনের ওধারের কামরা থেকে ডাল তোলার চামচের মত দেখতে কিন্তু আয়তনে বহু গুণ বড় একটা চামচ বের হলো। চামচের ওপর সোহেলের সেই প্লাস্টিক বল একখানা। চামচের হাতলটা বড় হতে হতে বারো-চোদ্দ ফুট লম্বা হলো। একটা সবুজ খেতের পাশ দিয়ে যাবার সময় আলগোছে সেটা নামিয়ে দেয়া হলো চামচ থেকে। হাতল আবার ছোট হাত হতে অদৃশ্য হয়ে গেল কামরার ভেতর।

তাহলে এই শুভেচ্ছা বিলাচ্ছে এবারের সাংস্কৃতিক মিশন! আর এই জন্যেই রেলপথে চলছে এরা। গোটা পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর এই বোমা ছড়িয়ে যাচ্ছে ওরা সবার অলক্ষে। কিন্তু কি ওদের উদ্দেশ্য? এই টাইম-বম্ব ফাটলে পরে কি হবে? কোন্ সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে আমাদের দেশের ওপর কে জানে। ভেড়ামারাতে পৌঁছেই রিপোর্ট লিখতে হবে। ঈশ্বরদিতে নঈমকে দিয়ে দেবে রিপোর্ট আর স্যাম্পল।

'টাশশ!' ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ কানে এল রানার। চমকে উঠল ও। অনুভব করল, কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বুলেট। পা দুটো ভাঁজ করে ফেলল রানা, তারপর দড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে আসতে থাকল। আবার সেই তীক্ষ্ণ শব্দটা এল কানে—'টাশশ!' এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলি। কামরার ভিতর চলে এল রানা।

বাথরুম থেকে চোখ-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। জানালার ধারে বসে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। বাসিমুখ কেমন যেন বিস্বাদ লাগছে। আকাশটা লাল করে দিয়ে সূর্য উঠছে পুব দিগন্তে।

ছয়

৩০ আগস্ট, ১৯৬৫

গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে সোজা ডাকবাংলোর পথে হাঁটা ধরল মাসুদ রানা। রাত এগারোটা।

টেপ-রেকর্ডারের স্পুলগুলো না পেয়ে জয়দ্রথ মৈত্রের চেহারাটা কেমন হবে ভেবে খুশি হয়ে উঠল রানার মেজাজ। মোলায়েম চাঁদের আলোয় রানার সুঠাম দীর্ঘ দেহের ছায়া পড়েছে রাস্তায়। লম্বা জনবিরল রাস্তাটায় থেকে থেকে শিউলীর তীব্র সুবাস আর থমথমে একটা শূন্য মঞ্চের রোমাঞ্চ। কাছেই ডাকবাংলো, আর বেশি দূর নেই—এগিয়ে চলল রানা দৃঢ় পদক্ষেপে।

রানা ভাবছে, কথা তো সে দিয়ে এল মিত্রাকে সাহায্য করবে—কিন্তু কিসের সাহায্য? কি বিপদ? কেমন সে চক্রান্ত? কতখানি ভয়ঙ্কর ওদের মৃত্যু-ফাঁদ?

আজ রাতটা রানার জীবনে এক চরম পরীক্ষার রাত। কিন্তু সিলেবাস বা প্রশ্নপত্র সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই! এমন কি কোন্ সাবজেক্টে পরীক্ষা তাও জানবার কোন উপায় নেই। সে কি উত্তীর্ণ হতে পারবে? থাক, অত ভেবে আর কি হবে—'কে সারা সারা,' যা হবার তা হবে।

ওর পাশ দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল ডাকবাংলোর দিকে।

রানার রিপোর্ট এবং সোহেলের স্যাম্পল এতক্ষণে পৌঁছে গেছে হেড অফিসে। রাহাত খানের কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া হঠাৎ মনে পড়ল রানার। আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব। কতদিন কত ভয়ঙ্কর কাজে রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, পিঠে হাত রেখে শক্তি, সাহস জুগিয়েছেন পিতার মত। কিন্তু তবু যেন কত দূরে। এক আধটা কথায় স্নেহ ঝরে পড়েছে রানার মাথায় আশীর্বাদের মত, তেমনি আবার সামান্য ভুলে কঠিন শাসনের চাবুক ক্ষতবিক্ষত করেছে রানার মন। সত্যিই অদ্ভুত মানুষটা।

দোতলার ওপর নিজের ঘরে ঢুকেই রানা টের পেল, ওর অনুপস্থিতিতে এ ঘরে অন্য লোক ঢুকেছিল। চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে ঘরের। পাশের ঘরে মিত্রার চুড়ির রিনিঠিনি শোনা যাচ্ছে। কি করছে মিত্রা?

পাশাপাশি দুই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। ওদিক থেকে বন্ধ। দুপুরে রানা লক্ষ্য করেছিল দরজার ফুটোটা। ভাবল দেখি তো কি করছে মেয়েটা। ফুটোয় চোখ রেখে অবাক হয়ে গেল রানা। এক ইঞ্চি দূরে আরেকটা চোখ! হেসে ফেলল সে। ফুটোয় চোখ রেখে মিত্রাও দেখতে চেষ্টা করছে রানার কার্যকলাপ!

স্নান সেরে নিল রানা। এই নিয়ে তিনবার হলো। তারপর একটা অ্যাশ কালারের ফুলহাতা প্লে-বয় শার্ট এবং নেভি ব্লু রঙের ফুল প্যান্ট পরে নিল। বিছানায় বসে হোলস্টার থেকে ওর একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী ডাবল অ্যাকশন সেমি-অটোমেটিক ওয়ালথার পি. পি. কে. পিস্তলটা বের করল। পয়েন্ট থ্রী-টু ক্যালিবার। বেশি বড় ক্যালিবার পছন্দ করে না রানা। ভারি পিস্তল দিয়ে কি হবে—হাতের সইটাই আসল। দ্রুত আটবার স্লাইড টেনে আটটা বুলেট বিছানায় ফেলল রানা। ইজেক্টার ক্লিপটা পরীক্ষা করল, কারণ ঠিকমত কাজ না করলে বিপদের সময় এ মারণাস্ত্র খেলনা হয়ে যাবে। ম্যাগাজিন রিলিজ বাটন টিপে খালি ম্যাগাজিন বের করে সাতটা গুলি ভরল সে তাতে। স্লাইড টেনে চেম্বারে বাকি গুলিটা ভরে দিয়ে আস্তে হ্যামারটা নামিয়ে রাখল। এবার ম্যাগাজিনটা যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিতেই ক্লিক করে ক্যাচের সঙ্গে আটকে গেল সেটা। গুলি ভরা দুটো এক্সট্রা ম্যাগাজিন পকেটে ফেলে পিস্তলটা আবার হোলস্টারে ভরে রাখল সে নিশ্চিন্ত মনে। উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে বেড সুইচ টিপে তিন ওয়াটের নীল বাতি জ্বেলে দিল রানা। তারপর জুতো-মোজা পরা

অবস্থাতেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। এক ঘণ্টা পর নীল আলোটাও গেল নিভে।

চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আধ হাত দূর থেকেও নিজের হাত দেখা যায় না। এত অন্ধকার, মনে হচ্ছে যেন চোখ না বুজেও ঘুমানো যাবে। চুপচাপ অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় শুয়ে আছে রানা। প্রতীক্ষা করছে। বাইরে ঝিঁঝি পোকার কোরাস ভরাট করে রেখেছে যেন অন্ধকারকে। কই, কিছুই তো ঘটছে না।

এই বিনিদ্র অপেক্ষার কি শেষ নেই? খুট করে একটা শব্দ হলো পাশের ঘরে। সজাগ হয়ে উঠল রানা। ঘটুক, যা হয় একটা কিছু ঘটুক। এভাবে অনির্দিষ্টকাল প্রতীক্ষা করা যায় না। কয়েকজন লোকের সাবধানী পায়ের শব্দ। চটাশ করে একটা চপেটাঘাতের আওয়াজ। মৃদুস্বরে দুই একটা কথাবার্তা। রানা বুঝল সময় উপস্থিত।

হঠাৎ তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে এল রানা। কি হলো? এমন জোরে ইলেকট্রিক শক্ লাগল কেন? বুকের ভেতর জোরে হার্ট-বিট্ হচ্ছে। পেন্সিল টর্চটা জ্বেলে দেখল লোহার খাটের পায়ার সঙ্গে দুটো তার জড়ানো। তার দুটোর অন্য মাথা চলে গেছে পাশের ঘরে। রানা আগে টের পায়নি এ তারের অস্তিত্ব। আলতো করে খাটটা ছুঁয়ে দেখল কারেন্ট নেই এখন।

ব্যাপার কি? তাকে কি ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে মারবার ফন্দি এঁটেছিল এরা? তাহলে এখন আর কারেন্ট নেই কেন? নাকি একটা বিশেষ মুহূর্তে যেন শক্ খেয়ে ওর ঘুম ভেঙে যায়, তাই এ ব্যবস্থা? রানা ঘুমিয়ে থাকলে এই শক্ লেগে তার ঘুম ভেঙে যেত, কিন্তু কিছুতেই সে বুঝতে পারত না হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল কেন। কিন্তু তার ঘুম ভাঙাতেই বা চাইবে কেন জয়দ্রথ মৈত্র।

কাঠের সিঁড়িতে কয়েকটা পায়ের শব্দ শুনতে পেলো রানা। একটু পরেই একটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

মিত্রাকে নিয়ে যাচ্ছে না তো লোকগুলো! কথাটা মনে আসতেই একলাফে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল রানা। দেখল মিত্রার ঘরের কপাট খোলা। একটা জীপ গাড়ি ডাকবাংলো থেকে বেরিয়েই ডান দিকে মোড় ঘুরল। পেছনে জ্বলছে দুটো লাল ব্যাক লাইট।

ছুটে মিত্রার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালল রানা। খাঁ-খাঁ করছে খালি ঘর। তবে কি সে রক্ষা করতে পারল না মিত্রাকে? কি মনে করবে মিত্রা? মনে করবে প্রাণভয়ে বিপদের সময় ঘর থেকে বেরোতে সাহস পায়নি ও।

তিনলাফে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে এল রানা। গাড়ি বারান্দায় একটা লাল রঙের হোণ্ডা ওয়ান-ফিফ্‌টি মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে স্টার্ট দেয়া অবস্থায়। ডাবল একজস্ট পাইপ দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নাম্বার প্লেটে বিদেশী নম্বর দেখে রানা বুঝল কোন টুরিস্ট হবে। হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে একটা ক্যানভাসব্যাগ আর ওয়াটার-বট্‌ল্ ঝোলানো। পেছনের ক্যারিয়ারে কিছু মালপত্র চামড়ার বেল্ট দিয়ে বাঁধা।

ফ্রস্টেড কাঁচের জানালা দিয়ে আবছা দেখল রানা একজন ফর্সা মত লম্বা লোক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছে। কাঁধে ঝোলানো একটা ফ্লাস্ক। টুরিস্টই হবে।

একবার একটু দ্বিধা হলো রানার। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি? লাফিয়ে উঠে বসল সে মোটর সাইকেলের ওপর। হেডলাইট অফ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল ডাকবাংলো থেকে। রাস্তায় পড়েই ডানদিকে মোড় নিল মোটর সাইকেল।

জীপ গাড়িটার কোন চিহ্ন নেই। পাকা মসৃণ নির্জন রাস্তা দিয়ে ফুলস্পীডে এগিয়ে চলল রানা। উইণ্ডস্ক্রীন নেই। হু হু করে বাতাস লাগছে চোখে মুখে। বাতাসের বেগে দুই চোখের কোণ দিয়ে পানি বেরিয়ে কানের নিচ দিয়ে গিয়ে শার্টের কলার ভিজছে।

হঠাৎ খটকা লাগল রানার মনে। সবগুলো ঘটনা অস্বাভাবিক নয়? ঠিক সময় মত ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, জীপগাড়ি, চালু অবস্থায় রাখা হোণ্ডা মোটর সাইকেল। সব যেন সাজানো-গোছানো ছিল রানার জন্যে। এমন তো হবার কথা নয়। ঠিক যেন মিল খাচ্ছে না। তাছাড়া এত রাতে ম্যানেজারের তো কাউন্টারে থাকবার কথা নয়। কার সঙ্গে কথা বলছিল টুরিস্ট? বুঝল রানা, ট্র্যাপে পা দিয়েছে সে। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে।

দূরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে জীপ গাড়ির লাল ব্যাকলাইট। স্পীড কমাল রানা।

রাজশাহী-নাটোর রোডে চলেছে ওরা।

এদিকে মিত্রার মনের মধ্যে চলছে তুমুল ঝড়।

জয়দ্রথ মৈত্রের ভয়ঙ্কর-প্ল্যান শুনে চমকে উঠেছিল সে। ও বলেছিল, 'আমাকে এভাবে ব্যবহার করবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? আমার মামাকে যদি বলি তখন আপনার কি অবস্থা হবে?'

হেসেছিল জয়দ্রথ। বলেছিল, 'মামার ভয় আমাকে দেখিয়ো না, মিত্রা। তুমি ছেলেমানুষ, সব কথা বুঝবে না। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তোমার। আমার একটি মাত্র মুখের কথায় তোমার মামার মন্ত্রীত্বের পদ চিরতরে ঘুচে যেতে পারে। ও-ভয় আমাকে দেখিয়ো না। আমি যা বলছি তা-ই তোমায় করতে হবে।'

'আমি কি বাজারের মেয়েমানুষ?' চোখের জল আর সামলাতে পারেনি অসহায় মিত্রা। রাগে, দুঃখে, অপমানে গলা বুজে এসেছিল ওর।

'দেখো মিত্রা, দেশের প্রয়োজনে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়। মাসুদ রানা শত্রু, ওকে ধ্বংস করতে হবে; তাতে তোমার আপত্তি নেই। কিন্তু, এটা বুঝছ না কেন, পাকিস্তানে এসে আমরা যথেষ্ট করেছি, এর পরেও আবার নিজেরা খুন-খারাবির মধ্যে জড়িয়ে পড়লে আমাদের এতদিনের মাস্টার প্ল্যান একদম ফেঁসে যাবে। আমরা ও-কাজে হাত দেব না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। ইয়ং টাইগারস-এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তোমাকে আমরা তাদের হাতে তুলে দেব—বিনিময়ে তারা মাসুদ রানাকে সরিয়ে দেবে পৃথিবী থেকে। এজন্যে যদি কোন হাঙ্গামা হয়, টাকার জোরে সব সামলে নেবে ওরা, আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।'

একদিকের খা ভিজিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করেছিল জয়দ্রথ মৈত্র, 'অনেক ভেবে এই প্ল্যান এঁটেছি আমি। তোমাকে ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি ভারতে।

তোমার প্রতি ইয়ং টাইগারস্-দের আগ্রহ অল্পদিনেই ফুরিয়ে যাবে। তারপর ওরা তোমাকে ব্যবহার করবে বড় বড় ব্যবসা ধরবার টোপ হিসেবে। অনেক বড় বড় অফিসার ওরা নিয়ে আসবে তোমার কাছে। তুমি তাদের নাচ দেখাবে, বিনিময়ে তথ্য সংগ্রহ করবে আমাদের প্রয়োজন মত। ঢাকায় আমাদের লোক তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে।'

শিউরে উঠেছিল মিত্রা।

'আর একটা কথা ভালমত জেনে রাখো। যদি বিশ্বাসঘাতকতা করো, নির্মম মৃত্যু ঘটবে তোমার। এখন থেকে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কার্যকলাপ আমরা লক্ষ করব।'

'আপনার পায়ে পড়ি, মৈত্র মশাই, আমাকে রেহাই দিন।' সত্যিই পা ধরতে গিয়েছিল মিত্রা।

'আমি দুঃখিত,' সরে গিয়েছিল জয়দ্রথ। 'তুমি এখন যেতে পারো।'

'আর আপনার প্ল্যান অনুযায়ী মাসুদ রানা যদি আমাকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে না আসে? তাহলে? আমাকেও ভাসিয়ে দিলেন, ওকেও খুন করতে পারলেন না।'

'আসতেই হবে তাকে। সে যে ধাতুতে গড়া—কোন নারীর অবমাননা সে সহ্য করবে না। গাধা একটা—সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেই। সে সব তোমার ভাবতে হবে না, নিখুঁত জাল পেতেছি আমি—শিকার তাতে পড়বেই।' হেসে চলে গিয়েছিল জয়দ্রথ পাশের ঘরে।

এতখানি অসহায় অবস্থা মিত্রার জীবনে আর কখনও আসেনি। এ কী চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ল সে? ভয়ানক রাগ হলো মাসুদ রানার ওপর। ওই, ওই শয়তানটার জন্যেই আজ ওর এই অবস্থা। ওকে যদি খুন করতে না চাইত জয়দ্রথ তবে তো মিত্রাকে ইয়ং টাইগারস্-এর হাতে তুলে দেবার প্রশ্নই উঠত না। আবার ভাবল, বেচারা রানা জানবে কি করে যে ওকে হত্যা করার বিনিময়ে জয়দ্রথ মিত্রাকে তুলে দিচ্ছে একদল বদমাইশের হাতে। জয়দ্রথই আসলে পাপিষ্ঠ, নীচ, নরাধম। তারপর আবার ভাবল, জয়দ্রথ তো নিজের স্বার্থে কিছু করছে না, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এঁটেছে এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র। এ না করলে তো জয়দ্রথ কর্তব্যচ্যুত হত।

তবে? তবে দোষ কার? মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যায় মিত্রার। দোষ মিত্রার ভাগ্যের। দোষ ওর রূপের, ওর গুণের। সে আত্মহত্যা করবে। আর তো কোন পথ খোলা রইল না তার জন্যে!

হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসল মন। কেন? কেন সে ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর খেলাকে নীরবে সহ্য করবে? এ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসবার কি কোন পথই নেই? নিজেকে রক্ষা করবার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। সে বাঁচতে চায়। বাঁচতে কে না চায়। দেশ, দলপতি, চক্রান্ত সব চুলোয় যাক। সে নিজেকে রক্ষা করবে। কিন্তু কি করে? এই বিদেশে কে আছে ওর আপনজন যে এগিয়ে এসে সাহায্য করবে? মাসুদ রানা?

অনেক ভেবে সে স্থির করেছিল সমস্ত চক্রান্তের কথা খুলে বলবে রানাকে। কিন্তু সুযোগ পেল কোথায়? চোখের ইঙ্গিতে ডেকে এনে গ্রীনরুমে যে দু'একটা কথা

হলো, তাতে রানার কাছে কিছুই তো পরিষ্কার হলো না। কোনও কথা খুলে বলা হলো না, এসে পড়ল জয়দ্রথ মৈত্র। কি ধরনের বিপদ ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সে-সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই রানার। দলপতির বদ্ধমূল ধারণা, রানা যে চরিত্রের মানুষ—কেউ বিপদে পড়লে সে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। এবং এগোলেই নিশ্চিত মৃত্যু। আজ সাবধান করে দেয়ার ফলে সে যদি মিত্রার সাহায্য প্রার্থনাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে মিথ্যা অভিনয় বলে মনে করে? যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে? তাহলে মিত্রার নিশ্চিত মৃত্যু। সে যদি আত্মহত্যা না-ও করে, জয়দ্রথ হত্যা করবে ওকে।

মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে নাকি মিত্রার? রানা তো কথা দিয়েছেই। নিষ্ঠুর চেহারার লোক হলে কি হবে—নিশ্চয়ই সে তার কথা রাখবে। আশ্বাস খোঁজে মিত্রা এসব ভেবে।

উপায় নেই। তার খাটের তলায় ঘাপটি মেরে বসে আছে একজন। টেপরেকর্ডারের স্পূল পুকুরে ফেলে দেয়ায় মিত্রার ওপর সন্দেহ হয়েছে জয়দ্রথ মৈত্রের—সে আর কোন সুযোগ দেবে না মিত্রাকে। অথচ ওই টেপরেকর্ডারের কথা মিত্রার জানা ছিল না। ভাগ্যিস রানা ওগুলো ফেলে দিয়েছিল—নইলে ওর বিশ্বাসঘাতকতার কথা আর গোপন থাকত না হিংস্র জয়দ্রথের কাছে। বুঝল কি করে মানুষটা!

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল পাঁচজন ইয়ং টাইগার। একজন টর্চ ধরল মিত্রার দিকে, আর একজন তুলে নিল ওকে বিছানা থেকে পাঁজাকোলা করে। মুখে অশ্লীল হাসি। ঠাঁই করে এক চড় দিল মিত্রা তার গালে। দলের অন্যান্যদের কি একটা ইঙ্গিত করে বেরিয়ে এল লোকটা দরজা দিয়ে বাইরে। গাড়িতে এনে তোলা হলো মিত্রাকে। মিত্রা চেয়ে দেখল মোটর সাইকেলটা যথাস্থানেই আছে।

ছেড়ে দিল গাড়ি। মিত্রা এখন ওদের।

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল মিত্রার।

রানা কি কথা রাখবে? ও কি আসবে এই পিশাচদের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করতে? কতদূর চলে এসেছে ওরা? রানা কি খোঁজ পাবে এদের তাঁবুর? যদি দেরি হয়ে যায়? শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল মিত্রা।

চোখ খুলেই দেখতে পেল মিত্রা বহুদূরে আবছা মত কি একটা আসছে গাড়ির পিছন পিছন। মাসুদ রানা! আসছে সে! হঠাৎ কেন জানি অদ্ভুত মায়া লাগল তার ওই দুঃসাহসী লোকটার জন্যে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মিত্রা শত্রুপক্ষের ওই দুর্দান্ত লোকটির জন্যে। ইশ্, কেন সে এই নিশ্চিত মৃত্যুর পথে টেনে আনল এমন একটা মানুষকে? যদি এখনও ওকে ফিরিয়ে দেয়ার উপায় থাকত কোনও। কিছু বুঝবার আগেই শেষ করে দেয়া হবে যে ওকে।

ইয়ং টাইগাররাও দেখল রানাকে। কিছু কথা হলো ওদের নিজেদের মধ্যে এক বিচিত্র ভাষায়। মিত্রা তার একবর্ণও বুঝল না।

বাম দিকের একটা সরু রাস্তায় ঢুকল এবার জীপ। কিছুদূর গিয়েই থামল জীপটা একবার। একটা বেরেটো অটোমেটিক সাবমেশিনগান হাতে নেমে গেল একজন। আরও আধ-মাইল খানেক গিয়ে হাতের ডাইনে মাঠের মধ্যে আলো দেখা গেল। পাশাপাশি তিনটে তাঁবু খাটানো। জীপ এসে থামল একটা তাঁবুর সামনে।

সাঙ্কেতিক কিচির মিচির ভাষায় একমিনিট কথাবার্তা বলল ওরা। চারজন রিভলভার হাতে ছড়িয়ে পড়ল তাঁবুর চারদিকের অন্ধকারে। আর একজন ধরল মিত্রা সেনের হাত।

'হাত ছাড়ো!' হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল মিত্রা সেন।

'ছোড় দেঙ্গে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা!' আরও শক্ত হলো মুঠো।

এমনি সময় দূর থেকে দশ-বারো সেকেণ্ড মেশিনগানের একটানা কর্কশ আওয়াজ ভেসে এল। এদিকে ওদিকে প্রতিধ্বনি উঠল তার। কান পেতে শুনল সে শব্দ ওরা দু'জন। দপ করে সব আশা ভরসা নিভে গেল মিত্রার। বুকের ভিতরটা দুর-দুর করে উঠল অজানা আশঙ্কায়। হাত-পা অবশ হয়ে এল।

মিত্রার অবস্থা দেখে খুব একচোট হাসল লোকটা, তারপর টানল ওকে তাঁবুর দিকে। 'কিউ বেকার ল্যড়্তি হো, ল্যড়কি।'

বন-বিড়ালীর মত আঁচড়ে-কামড়ে-খামচে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল এবার মিত্রা সেন মরিয়া হয়ে। ওর উন্মত্ত আক্রমণে ব্যথা পেয়ে একটু যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। সেই সুযোগে এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিল মিত্রা।

বিশ গজও যায়নি, পিছন থেকে ছুটে এসে ওর চুল টেনে ধরল লোকটা, তারপর প্রচণ্ড জোরে চড় কষাল মিত্রার গালে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল মিত্রা সেন। সেই অবস্থায় ওর একটা হাত ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল সে তাঁবুর দিকে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে মিত্রা, তাতে আনন্দ হচ্ছে ওর।

তাঁবুর ভেতর একখানা খাটিয়ার ওপর বিছানা পাতা। ছোট একটা টেবিলের ওপর হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। আর কোন আসবাব নেই। তাঁবুর মাঝখানে টেনে এনে মিত্রার হাত ছেড়ে দিল লোকটা। 'ফির অ্যায়সা কারোগে তো খুন কার ডালুঙ্গা। উটঠো, খাড়া হো যাও।'

মিত্রা উঠছে না দেখে লাথি মারবে বলে পা তুলল এবার লোকটা। ভয়ে কুঁকড়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল মিত্রা হামাগুড়ি দিয়ে। প্রচণ্ড জোরে এক লাথি এসে লাগল কোমরে। ছিটকে খাটিয়ার পাশে গিয়ে পড়ল মিত্রা। এগিয়ে আসছে লোকটা। আরেক লাথি থেকে বাঁচবার জন্যে এক পাক ঘুরেই স্থির হয়ে গেল মিত্রা। একটা দীর্ঘ মূর্তির ওপর চোখ পড়েছে ওর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

তাঁবুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাসুদ রানা!

সাত

৩১ আগস্ট, ১৯৬৫

'চোখ বন্ধ করো, মিত্রা।'

গম্ভীর কণ্ঠ রানার। হাতে ওয়ালথার পি.পি.কে। নলটা আরও কয়েক ইঞ্চি বড় হয়ে গেছে সাইলেন্সার লাগানোতে। চোখ বন্ধ করল মিত্রা। এক লাফে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লোকটা, হেঁচকির মত আঁৎকে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল। 'দুপ্।' একটা

মৃদু গম্ভীর শব্দ। তারপরই একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল মাটিতে ভারি কিছু।

'শিগগির বাইরে চলে এসো। মাটির দিকে চেয়ো না।'

তাঁবু থেকে বেরিয়েই এক দৌড়ে একটা আমগাছ তলায় এসে দাঁড়াল ওরা। রানা বলল, 'চিৎকার শুনে এক্ষুণি আরও লোক এসে পড়বে। সিকি মাইল দূরে মোটর সাইকেল। পালাতে হবে এখন, জলদি।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই তিন দিক থেকে টর্চ জ্বলে উঠল। গর্জে উঠল তিনটে রিভলভার। চট করে আমগাছের আড়ালে সরে গেল রানা মিত্রাকে নিয়ে, তারপর একটা টর্চ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

'বাপস্!' মোটা কর্কশ গলায় আওয়াজ এল। গুলি গিয়ে ঢুকল একটা টর্চের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গেল সব টর্চ রানার অব্যর্থ গুলির ভয়ে। কিন্তু আরও একবার গর্জে উঠল তিন রিভলভার। মিত্রাকে নিয়ে মাটির ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে সরে গেল রানা বেশ অনেকটা বাম দিকে। আগেই রাস্তার দিকে গেল না। বিশগজ ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে রাস্তা। তিনজনই আশা করবে রানা ওই পথে যাবে। গুলি এড়িয়ে রাস্তায় ওঠা সহজ হবে না।

গাছের আড়ালে চলে গেছে চাঁদ। মিনিট দু'য়েক চুপচাপ থেকে একটা টর্চ হঠাৎ রাস্তার দিকে একবার ফোকাস করেই নিভে গেল। সেই আলোয় রানা দেখল, গলিমুখের কাছাকাছি মেশিনগানধারী যে লোকটাকে কায়দা করে ও বন্দী করেছিল, সেই লোক কোন রকমে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে তাঁবুতে ফিরে আসছে।

তিনটে রিভলভার গর্জে উঠল একসঙ্গে। ঢিল খেলে কুকুর যেমন শব্দ করে ঠিক তেমনি একটা শব্দ করে বসে পড়ল লোকটা মাটিতে। রানা এবার দ্রুত বাম দিকের ঝোপঝাড়ের দিকে সরতে থাকল। দুটো টর্চ জ্বলে উঠল এবার অনেকটা নির্ভয়ে। ইচ্ছে করলে তিনজনকেই শেষ করে দিতে পারে রানা, কিন্তু তা না করে চুপচাপ মাটির সঙ্গে সেঁটে থাকল। রানার কয়েক ফুট পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল তিনজন আহত লোকটার দিকে। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে বটে, কিন্তু পাল্টা গুলি করতে পারে ভেবে আরও কয়েক রাউণ্ড গুলি করল ওরা গজ দশেক দূরে দাঁড়িয়ে। একেবারে স্থির হয়ে যেতে এগিয়ে গেল সামনে।

রানা ততক্ষণে মিত্রার হাত ধরে জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। মিনিট পাঁচেক একটানা ছুটে একটা ঝোপের ধারে দাঁড়াল রানা। মোটর সাইকেলটা নিয়ে এল ওপাশ থেকে।

একটু দ্বিধা করল মিত্রা মোটর সাইকেলের পেছনে উঠতে। টাইমবম্বটার কথা মনে হলো। কিন্তু আর তো উপায় নেই এখন। কাঁচা রাস্তা দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে চলল ওরা বড় রাস্তার দিকে।

'বড় রাস্তায় বাস-টাস পাওয়া যাবে না?' জিজ্ঞেস করল মিত্রা।

'এত রাতে কি করে বাস পাবে? আর বাসের দরকারই বা কি? এই ষাট মাইল যেতে বড় জোর সোয়া ঘণ্টা লাগবে হোণ্ডায়।'

'না, মানে, আমরা কোন ঝোপঝাড়ের মধ্যে তো লুকিয়ে থাকতে পারি রাতটা। সকালে না হয় বাসে ফেরা যাবে রাজশাহী।'

'হঠাৎ বাসের প্রতি তোমার এত ভক্তি এসে গেল কেন, মিত্রা?' হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

কোন উত্তর দিল না মিত্রা। ওর অস্বস্তিটা মনে মনে উপভোগ করছে রানা। বড় রাস্তায় উঠল ওরা। হেড লাইট জেলে দিয়ে মাইল মিটারের দিকে চেয়ে বলল, 'সিক্সটি ফাইভ।'

পেছনে শক্ত করে রানার কাঁধ ধরে বসে আছে মিত্রা। বাতাসে ওর চুল উড়ে এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছে রানার গলায়।

'মোটর সাইকেলটা আমাদের ছেড়ে দেয়া উচিত,' বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করে বলল মিত্রা।

'কেন বলো তো?'

'তুমি জানো না, এতে টাইম-বম্ব ফিট করা আছে। অল্পক্ষণেই ফাটবে।'

'টাইম-বম্ব? তা, এতক্ষণ বলোনি কেন?' আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। কিন্তু মোটর সাইকেলের স্পীড কমাল না একটুও।

'সেই কখন থেকেই তো বলছি, শুনছ তো না। আর শুনেও তো থামাচ্ছ না!' উদ্বেগ প্রকাশ পেল মিত্রার গলার স্বরে।

'ওটা এখন আমার পকেটে।' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল রানা।

মিত্রা ভাবল, সাংঘাতিক ধুরন্ধর তো ব্যাটা! নইলে আর এত নাম! আমাদের সার্ভিসে এর মতন একটা লোকও যদি থাকত। এতবড় বুকের পাটা আর এমনি বিরাট মন!

'তুমি ঠিক সময় মত না পৌঁছলে আমার কি যে হত! মেশিনগানের আওয়াজ শুনে আমি তো সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই চেয়েছিলাম। পেছন থেকে গিয়ে ব্যাটাকে কাবু করে ফেলে ফাঁকা আওয়াজ করেছিলাম, যাতে সবাই নিশ্চিন্ত থাকে আমার মৃত্যু সম্পর্কে।'

'উহ্! কি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল ওরা সেই লোকটাকে তুমি মনে করে।'

মাইল মিটারের কাঁটা একেকবার সত্তরের ঘরে গিয়ে থর থর কাঁপছে—আবার খারাপ রাস্তায় চল্লিশ এমন কি তিরিশে আসছে নেমে। জোর বাতাসে আঁচল উড়ছে মিত্রার। সামনের রাস্তাটা আলোকিত করে এগিয়ে চলেছে ওরা। পেছনে বিশাল অন্ধকার যেন গ্রাস করতে চাইছে ওদের, তেড়ে আসছে হিংস্র নখদন্ত বের করে, কিন্তু ধরতে পারছে না, পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা সামনে। আকাশে মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারার চোখে নীল আলো। মুক্তির আনন্দে মিত্রা বলছে জয়দ্রথের চক্রান্তের কথা—কিন্তু অনেক কিছু রেখে ঢেকে।

'তাহলে এই ছিল প্ল্যান? আমাকে হত্যার বিনিময়ে ওরা পাচ্ছিল তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'আহ্-হা। আমি যদি পেতাম এমন সুযোগ। সব শালাকে সাফ করে দিতাম।'

'বুঝলাম, মস্ত বীরপুরুষ তুমি। কিন্তু আমাকে নিয়ে কি করতে বলো তো? বৌ-ছেলেমেয়ে নেই?'

'নাহ্। প্রথমটাই হলো না—শেষেরগুলো আসবে কোত্থেকে?'

'বিয়ে করোনি কেন?'

'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। তাছাড়া আমার এই বিপজ্জনক জীবনে কে আসবে? মেয়েরা বড় হিসেবী।'

'ভুল করে চেয়েছিলে কাউকে?'

'চেয়েছি।'

'কাঁকে?'

'শুনে তোমার লাভ? ভাবছ গদগদ কণ্ঠে তোমার নাম বলব, না? আর কলকাতায় ফিরে পাকিস্তানী এক ছোঁড়াকে পাগল করে দিয়ে এসেছ ভেবে অনাবিল আনন্দ লাভ করবে। সেটি হচ্ছে না।'

'তুমি একটা ছোটলোক।'

কথাটা বলেই কাঁধ ছেড়ে দিয়ে আলতো করে রানার মাথার পেছনে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল মিত্রা। কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে একমুঠি চুল আলগা করে ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রানার মাথাটা। আবার বলল, 'তুমি একটা ছোটলোক।'

একটু পরেই চমকে উঠল মিত্রা। পিছন থেকে একটা গাড়ি আসছে না?

'রানা!' ভয়ে কেঁপে উঠল মিত্রার কণ্ঠস্বর। 'ওরা আসছে!'

'হ্যাঁ, রিয়ার-ভিউ মিররে অনেকক্ষণ ধরে দেখছি। বিপদেই পড়া গেল। এগিয়ে আসছে ওরা ফুল স্পীডে। আমরা চল্লিশের বেশি স্পীড দিতে পারছি না। আর দশ মিনিটেই ধরে ফেলবে।'

'তাহলে উপায়!' উৎকণ্ঠিত মিত্রার কণ্ঠে স্পষ্ট হতাশা। জবাব দিল না রানা, দ্রুত চিন্তা চলছে তার উর্বর মস্তিষ্কে।

ধীরে ধীরে পেছনের হেডলাইটের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর কোন উপায় নেই। একটা পিস্তল নিয়ে মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। এগিয়ে আসছে জীপ। এবার নিশ্চিত মৃত্যু।

হঠাৎ সামনের হ্যাণ্ডেল থেকে মিলিটারি মডেলের বড় ওয়াটার বটলটা নিয়ে মিত্রাকে দিল রানা। বলল, 'এর মুখটা খুলে ভেতরের পানি সব ফেলে দাও তো, মিত্রা।'

'এটা দিয়ে কি হবে?' জিজ্ঞেস করল মিত্রা।

'যা বলছি তাই করো। জলদি!' ধমকে উঠল রানা। পানি ফেলে দিল মিত্রা কর্ক খুলে।

হঠাৎ ডাইনের মোড়টা ঘুরেই লাইট অফ করে দিয়ে কষে ব্রেক চাপল রানা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে মিত্রা। কয়েক গজ গিয়েই থেমে গেল ভারি মোটর সাইকেল। স্ট্যাণ্ডে তুলে দিয়ে মিত্রার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে টান দিয়ে ফুয়েল পাইপটা খুলে ফেলল সে। বোতলটা ধরল পাইপের মুখে। দ্রুত নেমে আসতে থাকল পেট্রোল।

পিছনের গাড়িটা একেবারে কাছে এসে পড়েছে এবার। ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হেড লাইটের আলোয় রাস্তার সোজাসুজি মস্ত ছাতার মত ছাতিম গাছটা আলোকিত। দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা। এক্ষুণি এসে পড়বে। আর অপেক্ষা করা যায় না। বোতলটার চারভাগের তিনভাগ ভরতেই পেট্রোল শেষ হয়ে গেল ট্যাঙ্কের। মিত্রার হাত ধরে এবার দৌড়ে রাস্তার ডানদিকের একটা শুকনো নালা পেরিয়ে

ঝোপের ধারে সজনে গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল রানা। পকেট থেকে রুমাল বের করে ভিজিয়ে নিল পেট্রোলে। রুমালের অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দিল পেট মোটা ওয়াটার-বটলের মধ্যে, বাকি অর্ধেক বাইরে বের করে রেখে ওটার মুখে কর্ক এঁটে দিল শক্ত করে। মুখে বলল, 'মলোটভ ককটেল।'

মোড় ঘুরেই ব্রেক করল জীপটা রাস্তার মাঝখানে মোটর সাইকেল দেখে। রাস্তার ওপর ছেঁচড়ে কিছুদূর গিয়ে পেছন দিকটা স্কিড করে একটু বাঁয়ে হেলে থামল জীপ। তিন সেকেণ্ড থমকে থাকল। তারপর এক পশলা গুলি বর্ষণ করল মোটর সাইকেলটার ওপর।

একটা শেয়াল বোধহয় এতক্ষণ গোপনে লক্ষ করছিল রানা ও মিত্রার সন্দেহজনক কার্যকলাপ। গুলির শব্দে হাত পাঁচেক দূরের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল। পাতার ওপর মচমচ শব্দ হতেই আবার গর্জে উঠল সাব-মেশিনগান। একটা চিৎকার করেই পড়ে গেল শেয়ালটা মাটিতে।

এবার একজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। 'উতারো স্যব্ গাড়িসে! ঢুণ্ডকে নিকালো উও কুত্তাকো।'

খট করে শব্দ হলো রানার লাইটারের। রুমালের এক কোণে আগুনটা ছুঁইয়ে দিয়েই বোতলটা ছুঁড়ে মারল সে গাড়ির ওপর। আলো দেখেই আবার ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল বেরেটা সাব-মেশিনগান। নরম সজনে গাছের গায়ে ফুটো হয়ে গেল অনেকগুলো।

ব্যাপারটা বোঝার আগেই রানার আগুনে বোমাটা গিয়ে পড়ল জীপের ভিতর। বিস্ফোরণের শব্দ হলো একটা। দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল গাড়িতে। সর্বাঙ্গে আগুন লেগে গেছে ভেতরের লোকদের। হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে পাগলের মত চিৎকার করছে চারজন ইয়ং টাইগার। সারা শরীরে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। জীপের পেট্রোল ট্যাঙ্ক বার্স্ট করল। নরক কুণ্ড জ্বলে উঠল যেন। আগুনের লেলিহান শিখা উঠল পঁচিশ-তিরিশ হাত উঁচু পর্যন্ত। সেই উত্তাপের হল্কা এসে লাগল রানা ও মিত্রার মুখে। মাংস পোড়া গন্ধ ছুটছে চারদিকে। এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চোখ ঢাকল মিত্রা।

বহু কষ্টে একজন লোক জীপ থেকে বেরোল। মশালের মত আগুন জ্বলছে ওর সারা দেহ ঘিরে। একটা চুলও নেই মাথায়। দু-তিন পা এগিয়েই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। বীভৎস দৃশ্য।

আগুন একটু কমলে পর মোটর সাইকেলটা স্ট্যাণ্ড থেকে নামাল রানা। ঠেলে আরও কয়েক গজ দূরে নিয়ে গেল আগুন থেকে।

'ট্যাঙ্কে তো আর পেট্রোল নেই। এখন ফিরব কি করে?' মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

উত্তর না দিয়ে ফুয়েল পাইপটা যথাস্থানে লাগিয়ে নিয়ে রিজার্ভ ট্যাঙ্কের চাবি খুলে দিল রানা। স্টার্টার বাটন টিপতেই মৃদু গর্জন করে চালু হয়ে গেল ফোর-স্ট্রোক এঞ্জিন।

আবার হু-হু করে বাতাস কেটে অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলল ওরা রাজশাহীর দিকে। আরও বিশ মাইল আছে। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে রানার। বিয়োগান্ত নাটক দেখে হল থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন। জোর করে দূর করে দিল

সে মন থেকে দুঃস্বপ্নের মত ঘটনাগুলোর স্মৃতি।

চাঁদ ডুবে গিয়েছে। জ্বলজ্বল করছে শিশির ভেজা শুভ্র তারাগুলো। থেকে থেকে হাসনাহেনা, শিউলি আর ছাতিমের ভারি সুগন্ধ জমাট বেঁধে আছে রাস্তার ওপর। একটা নক্ষত্র খসে পড়ল।

'রানা।'

'বলো।'

'যখন তারা খসে পড়ে তখন নাকি মনে মনে যে যা চায় তাই পায়? তুমি বিশ্বাস করো একথা?'

'তুমি নিশ্চয় করো? কি চাইলে শুনি?'

'তোমার বন্ধুত্ব।' গালটা রাখল সে রানার পিঠের ওপর।

'তথাস্তু?' খোদ ভগবানের মত বলল রানা। তারপর হাসল।

'রানা।' আবার ডাকল মিত্রা একটু পর।

'কি বলছ?'

'তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলাম; তুমি দিয়েছ। আমার কাছে কি তোমার কিছুই চাওয়ার নেই?'

'আছে, যা চাইব দেবে?'

'তোমার জন্যে সব দিতে পারি আমি।'

'সত্যিই?'

'সত্যি। কি চাও তুমি বলো।'

'ইনফরমেশন।'

কেউ যেন কালি মাখিয়ে দিল মিত্রার মুখে। এক মুহূর্তে বাস্তব জগতে ফিরে এল সে। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা ইনফরমেশন চাইছে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের মিত্রা সেনের কাছে। কথা দিয়েছে সে। এখন ফেরাবে কি করে? চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ।

'দ্বিধা হচ্ছে, মিত্রা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। নিজের স্বার্থে জয়দ্রথের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমার কাছে সাহায্য চেয়েছি আমি, রানা। কেবল নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে। তোমার বিরুদ্ধে জয়দ্রথের চক্রান্ত সফল হলো না আমি স্বার্থপরের মত বিশ্বাসঘাতকতা করলাম বলে। অদ্ভুত এক মানসিক পীড়ায় ভুগছি আমি, রানা। আমার বিবেক ছিন্নভিন্ন করছে আমাকে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আমি অন্যায় করেছি। তবু সান্ত্বনা ছিল—নিজেকে রক্ষা করবার অধিকার সবার আছে। কিন্তু তোমাকে যদি আমি কোন ইনফরমেশন দিই তবে কোন সান্ত্বনাই আর থাকবে না আমার, রানা। তোমাকে কথা দিয়েছি, যদি বলো দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হতে…'

'থাক তাহলে।'

'আমাকে ক্ষমা করো রানা। তাছাড়া আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু…'

'বেশ, ক্ষমা করে দিলাম।'

'আর কিছু চাইবে না?'

'না।'

'আমি যদি কিছু দিই গ্রহণ করবে?'

'দিয়েই দ্যাখো না!'

'তোমার বাম হাতটা দাও।'

পিঠের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। নিজের অনামিকা থেকে খুলে একটা ছোট্ট রিং পরিয়ে দিল মিত্রা ওর কড়ে-আঙুলে। 'আমার স্মৃতিচিহ্ন।'

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ।'

তীরের মত বাতাস ভেদ করে এগিয়ে চলল শক্তিশালী দ্বিচক্র যান। এসে পড়েছে রাজশাহী। সারি সারি বন্ধ দোকানপাট আর দালান কোঠা ছাড়িয়ে চলল ওরা ডাকবাংলোর দিকে। মোটর সাইকেলটা ডাকবাংলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে উঠে এল ওরা দোতলায়। সারা ডাকবাংলো ঘুমে অচেতন। ঘড়িতে তখন চারটা।

মিত্রাকে ওর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে রানা চলে এল নিজের ঘরে। প্রথমেই পিস্তলটা পরিষ্কার করল যত্নের সঙ্গে। আরও দুটো গুলি ভরে নিল ম্যাগাজিনে। শরীরে ক্লেদাক্ত ক্লান্তি। স্নান সেরে নিল রানা। তারপর ঘরের সঙ্গে লাগানো ছোট্ট ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। গোটা শহরটা নিঝুম ঘুমে আচ্ছন্ন। দূরে লাইট পোস্টের আলোর চারধারে কতগুলো পোকা ঘুরছে অনবরত। অনেক কথা ভাবছে সে। অনেক, অনেক পুরানো কথা।

বিশ মিনিট পর বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল রানা।

গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল একটু পরেই।

সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল রানার। এত চুপচাপ কেন? দেখল, পাশের ঘরে কেউ নেই। সারা ডাকবাংলোতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। ভোজবাজির মত যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে সাংস্কৃতিক মিশনের গোটা দলটা। যেন কোথাও কেউ কখনও ছিল না।

আট

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

'মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও, মাসুদ রানা!' ঠিক চার ফুট সামনে থেকে ভেসে এল জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

এয়ারকুলারের একটা মৃদু গুঞ্জন আসছে কানে। সাউণ্ডপ্রুফ ঘরটায় একজনকে গুলি করে হত্যা করা হলে পাশের ঘরের কেউ টের পাবে না। কিন্তু চমকে উঠল না রানা। ডান হাতটা দ্রুত চলে এল না কোটের নিচে বগলের নিচে লুকানো স্প্রিংলোডেড শোল্ডার হোলস্টারের কাছে। এক লাফে সরে গেল না সে আততায়ীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার জন্যে। যেমন ছিল, তেমনি স্থির হয়ে বসে রইল। কোন রকম চাঞ্চল্যই প্রকাশ পেল না রানার ব্যবহারে। কারণ, কথাটা উচ্চারিত হয়েছে পুরু কাচ ঢাকা দামী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে পিঠ-উঁচু চেয়ারটায় উপবিষ্ট মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খানের কণ্ঠ থেকে।

'বড় বীভৎস মৃত্যু, স্যার! যাই হোক, আমি প্রস্তুত। কিন্তু ঘন্টা তিনেক সময় দিতে হবে। মৃত্যুর পর তো আর হবে না—কয়েকটা কাজ সেরে নিতে চাই।'

'আজ সন্ধে পর্যন্ত সময় আছে।' হাডসন হাভানা ধরিয়ে নেয়ার জন্যে থামলেন রাহাত খান, তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন, 'আর এই চিঠিটা রেখে দাও। ইচ্ছে করলে আজই নাভানা ট্রেডার্স থেকে ডেলিভারি নিতে পারো তোমার নতুন টয়োটা করোনা গাড়ি।'

করোনা পেয়ে রানার ভিতরে কি প্রতিক্রিয়া হবে ভাল করেই জানা আছে রাহাত খানের। তাই আর রানার মুখের দিকে না চেয়ে একটা ফাইল নিয়ে পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করলেন।

রানা তুলে নিল চিঠিটা। শেষ কালে ফিফটিন হানড্রেড সি. সি. ফ্যামিলি কার! ছি, ছি। ক্ষোভে, দুঃখে নিজের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করল রানার। মনটা বিষিয়ে গেল রাহাত খানের ওপর। অনেক চেষ্টায় মুখের চেহারাটা ভদ্রোচিত রেখে বলল, 'কিন্তু অন্য কোন বাজে গাড়ি নিয়ে গেলে হয় না, স্যার? আমার জাগুয়ারটা এভাবে ভেঙেচুরে···মানে ওটা আমার···'

'যত প্রিয় গাড়িই হোক না কেন ওটাতেই তোমার অ্যাকসিডেন্ট করতে হবে। গাড়ির চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য অনেক বেশি। আমি চাই না ভবিষ্যতে তুমি একটা অসাধারণ গাড়ি চালিয়ে ফিল্ম স্টারের মত সবার মুখ-চেনা হয়ে যাও। ওই গাড়ি চালানো আজই শেষ। চোখে পড়ার মত কোন শখ বা অভ্যাস তোমার জীবনে হারাম।'

'বুঝলাম, স্যার। কিন্তু হঠাৎ আমার মৃত্যু-সংবাদ ছাপছেন কেন কাগজে? চেনাজানা লোক জিজ্ঞেস করলে কি বলব?' কাজের কথায় আসতে চেষ্টা করল রানা।

'আগামী কয়েকদিন চেনাজানা লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাল ভোর চারটের ফ্লাইটে তুমি যাচ্ছ ব্যাঙ্কক। রেঙ্গুন হয়ে। তারপর থাইল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী হিসাবে আসছ কলকাতায়—ওখান থেকে যাচ্ছ টিটাগড়ে। আমি চাই আই.এস.এস. যেন তোমার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে। সহজে যেন তোমার ছদ্মবেশ ধরতে না পারে। ওরা খবরের কাগজ এবং গোপন ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সংবাদ পাবে তোমার মর্মান্তিক মৃত্যুর। কল্পনাও করতে পারবে না তোমার টিটাগড়ে উপস্থিতি। তারপর যখন কাজ উদ্ধার করে ফিরে আসবে এখানে, অবশ্য যদি ফেরা সম্ভব হয়, তখন ভুল সংশোধন করে ছোট্ট দু'তিন লাইন আবার ছাপা যাবে পত্রিকায়। সে সব তোমার ভাবতে হবে না।'

'টিটাগড় গিয়ে কি করতে হবে আমাকে?'

'সেটা বলবার জন্যেই ডেকেছি তোমাকে। আধঘন্টার মধ্যেই আসছেন জুয়োলজিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর আলী আকবর। অনেক কথা জানতে পারবে তাঁর কাছে। তার আগে এই পৃষ্ঠা দুটোতে একবার চোখ বুলিয়ে নাও। "B" লেখা কাগজটা ভাল করে পড়ো; ওইটাই আসল।'

সাগ্রহে ফাইলটা নিল রানা। কিন্তু পরমুহূর্তেই চুপসে গেল ফাটা বেলুনের মত। হাফ ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর ইংরেজীতে টাইপ করা:

'A'
LOCUST

Species;

1. Locusta migratoria L.-widest range of distribution, universal between L. 20; N–60.S: five sub-Species.

(a) L. migratoria migratoria–South East Russia.

(b) L. migratoria rossica–Central Russia & Western Europe.

(c) L. migratoria migratorioides–Africa & Western Asia.

(d) L. migratoria capito–Madagascar.

(e) L. migratoria manilensis–Malaysia, East Indies, Phillipines & China.

2.Melanophis Spretus Walsch (M. mexicanus Sanss). Plains of America.

3. Chortoicetes Terminifera (walker)–Australian Plague Locust.

4. Docistaurus Moroccanus–Moroccan Locust–Countries of the Mediterranean, West & South Russia.

5. S. peranensis–South American Locust.

6. Locustana Pardalina–Brown Locust–South Africa.

7. Nomadacris Septemfasciata–Red Locust–South Africa.

8. Schistocera Gregaria–Desert Locust–Whole of Africa and Western Indo–pakistan.

9. Patanga Succincta–(Acridium succinctum)–Bombay Locust–Indo-Malaysia.

'B'
Patanga Succincta
Bombay Locust

(1) Breeding habitat–desert or semi desert areas.

(2) 150 to 200 eggs at a time in the sand by a single female.

(3) Humidity and temperature have great efffect at all phases.

(4) Morphological diff.– Ph. gregaria–6 eyestrips

antennal segments
Ph. solitaria--6-7 eye strips
27-28 antennal segments.

(5) Stages a) Egg) b) Pupa c) Larva (hopper) d) Adult.

(6) Swarm Movements--Down-wind direction.

(7)Wing movement--17 cycles per second.

(8) Speed--2.5 miles to 3 miles per hour.

(9) Flight habit--Day time. Never fly at night or early morning.

(10) Locusticides. r-BHc and DNC are effective. But no locusticide can repulse a swarm at flight.

কাগজ দুটো শেষ করেই চোখ তুলল রানা। দেখল তার দিকে চেয়ে আছেন রাহাত খান। ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

'এ যে দেখছি পঙ্গপালের ইতিবৃত্ত! এর সঙ্গে টিটাগড়ের সম্পর্ক কি?'

'সত্যিই কোন সম্পর্ক আছে কি না আমরা কেউ-ই জানি না। সবই অনুমান। নিশ্চিত হবার জন্যেই তোমাকে পাঠানো হচ্ছে সেখানে। এখন শোনো, সবটা ব্যাপার খুলে বলি। তুমি যে সবুজ গোলাকার জিনিসটা পাঠিয়েছিলে ঈশ্বরদি থেকে, সেটা একটা বিচিত্র টাইমবম্ব। এর মধ্যে ঘড়ির মত কোন ব্যবস্থা নেই। ছোট্ট একটা ছিদ্র বিশিষ্ট অ্যাসিডের ক্যাপসুল আছে। একটা প্লাস্টিকের ফিউজকে নির্দিষ্ট গতিতে জ্বালাতে জ্বালাতে এগোচ্ছে সে অ্যাসিড। যখনই পুরো প্লাস্টিকের ফিউজটা ক্ষয় হয়ে যাবে, অমনি ফাটবে বম্ব।'

এইবার কিছুটা উৎসাহ বোধ করল রানা। সোজা হয়ে বসল সে। চুরুটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন রাহাত খান।

'কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো? ওর ভেতর লোহা লক্কড়ের বদলে আছে পাতলা কয়েকটা কাঁচের গোলক। তেল জাতীয় একটা জিনিস ভরা সবগুলোর মধ্যে। বোমাটা ফাটলে পরে এগুলো ছিটকে অনেক দূরে গিয়ে পড়বে।'

'কি জিনিস ভরা সেই কাঁচের বলে?'

'Molasses scent—চিটাগুড়ের গন্ধ। আর কিছু না। বল ভাঙলেই দশ মিনিটের মধ্যে উড়ে যাচ্ছে বাতাসে ভেসে। ডক্টর আলী আকবর ল্যাবরেটরিতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন একটা বল। ওঁর রিপোর্টে দেখছি প্রথমে চিটাগুড় থেকে তেল জাতীয় এই গন্ধ এক্সট্র্যাক্ট করে নিয়ে তার মধ্যে হাইপ্রেশার দিয়ে হাইড্রোজেন মলিকিউল তুলে নিয়ে বয়লিং পয়েন্ট পনেরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট করে দেয়া হয়েছে। একে ডিহাইড্রোজেনেশন বলে। বয়লিং পয়েন্ট যদি অতখানি নিচু করে দেয়া যায় তাহলে এ ধরনের যে কোন জিনিস মিনিমাম অ্যাটমসফেরিক টেম্পারেচারেও এভাপোরেট করবে। উড়ে যাবে বাতাসে স্পিরিটের মত।'

'কিন্তু এতে লাভ কি হবে ভারতের?'

'সেটাই তো প্রশ্ন। হিসেব করে দেখা গেছে, যে হারে প্লাস্টিক ফিউজটা ক্ষয় হচ্ছে, তাতে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে তিনটেয় ফাটবে টাইম বম্ব।

প্রত্যেকটা বোমাই একসঙ্গে ফাটবে বলে ধারণা করে নেয়া অসঙ্গত হবে না। এখন ওই বিশেষ দিনে যদি সারা পূর্ব-পাকিস্তানের সীমানা বরাবর এই সেন্ট-বম্ব ফাটে, তাহলে কি এমন সুবিধা হতে পারে ভারতের? ডক্টর আকবর সমাধান দিচ্ছেন—পঙ্গপাল।'

'পঙ্গপাল!' রানার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিল একটা। একসঙ্গে দ্রুত অনেকগুলো চিন্তা খেলে গেল মাথার মধ্যে। একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা উঁকি দিল ওর মনের কোণে। হতেও তো পারে, ওদের দ্বারা অসম্ভব কি?

ইন্টারকমে গোলাম সারওয়ারের গলা শোনা গেল।

'ডক্টর আলী আকবর, স্যার।'

'ভেতরে পাঠিয়ে দাও। আর নাসরীনকে বলো, যেন নিজ হাতে তিন কাপ কফি বানিয়ে পাঠিয়ে দেয় আমার কামরায়।'

চট করে একবার রাহাত খানের দিকে চেয়ে নিয়ে মৃদু হাসল রানা। মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন ঘরের ভিতর। উঠে দাঁড়িয়ে সাদরে ডেকে বসালেন তাঁকে রাহাত খান। ফর্সা গায়ের রঙ, খয়েরি চোখের মণি। ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিলেতি ছাঁটের নীল স্যুট। প্রশস্ত কপালে প্রতিভার ছাপ। রানার পাশের চেয়ারটা ছেড়ে বসলেন ডক্টর আলী আকবর। হাতের অ্যাটাচি কেসটা রাখলেন খালি চেয়ারের ওপর। পরিচয় করিয়ে দিলেন রাহাত খান।

'আমি রানাকে সমস্ত ব্যাপার মোটামুটি বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। ও যাচ্ছে আমাদের তরফ থেকে টিটাগড়ে। রানা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল ওই সেন্ট থেকে আপনি পঙ্গপালের কথা মনে করলেন কেন। আপনিই বরং বুঝিয়ে দিন।'

'এটা খুব সাধারণ কথা। এই গন্ধ লোকাস্টকে আকর্ষণ করে, এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় রিসার্চ সেন্টারে পঙ্গপাল ধ্বংস করবার জন্যে লোকাস্টিসাইড তৈরি হচ্ছে এবং এই সেন্ট-এর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই গন্ধের সঙ্গে পঙ্গপাল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।'

'কিন্তু,' রাহাত খান সূত্রটা ধরলেন কথার, 'দেখা যাচ্ছে লোকাস্টিসাইডের কোন চিহ্নও নেই, শুধু গন্ধটাই ছড়াতে চাইছে ওরা আমাদের আকাশে বাতাসে। তার মানে কি হতে পারে? একটাই অর্থ আপাতত মনে আসছে: ওরা সীমান্ত থেকে পঙ্গপাল ছাড়বে ওই দিন। বিনা যুদ্ধেই আমাদের এই কৃষি-প্রধান দেশটা ধ্বংস করে দেবে। তাই না?'

'সত্যিকার কোন ক্ষতি করবার মত অত পঙ্গপাল পাবে কোথায় ওরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার কাছেও ব্যাপারটা খুবই অবাস্তব বলে মনে হয়েছে, মি. খান।' বললেন ডক্টর আলী আকবর। 'যদিও আমি একে সম্ভব বলে বিশ্বাস করি না, তবু সারাদিন ছটফট করেছি দুশ্চিন্তায়, এবং শেষ পর্যন্ত কাল সারা রাত পরিশ্রম করে একটা সলিউশন তৈরি করেছি। স্প্রে-গানে ভরে এনেছি সেটা। যদি সত্যিই ওখানে গিয়ে দেখেন পঙ্গপালের কারবার, তাহলে এই সলিউশনটা স্প্রে করে আসবেন।' অ্যাটাচি কেস থেকে একটা কৌটা বের করে সযত্নে টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি।

'কি আছে এতে?'

'ম্যাটারিজিয়াম।'

কফি এল। চুপচাপ কফি খেলেন, তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর আকবর।

'এটা দিতেই এসেছিলাম। পরে আরও আলাপ হবে, এক্ষুণি আমার একটা ক্লাস আছে, আজ আসি।'

'আপনি কি ইউনিভারসিটিতে এখনও আছেন?' জিজ্ঞেস করেন রাহাত খান।

'তা ঠিক নেই, পুরানো অভ্যেস, বুঝলেন না? এক-আধটা ক্লাস নিই। আচ্ছা আসি।'

ব্যস্ত-সমস্ত প্রফেসর বেরিয়ে গেলেন। ওঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন রাহাত খান। বললেন, 'অদ্ভুত মানুষ! জীবনে ছুটি কাকে বলে জানেন না। এই রকম আরও কিছু লোক থাকা দরকার ছিল আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে।'

আবদুল কাপ নিতে এল। এক চুমুকে কফি শেষ করে আবার কাজের কথায় ফিরে গেলেন রাহাত খান।

'তাহলে দাঁড়াল এই, আমাদের দেশে ভারতীয় গুপ্তচরদের তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সঠিক জানা যাচ্ছে না। অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে সবটুকু। কাজেই তোমাকে যেতে হচ্ছে টিটাগড়। দুই বর্গ মাইল জায়গা জোড়া ওদের সেই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতে হবে তোমার। প্রথম কাজ ওদের হাতে ধরা না পড়া। কারণ, তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু। দ্বিতীয় কাজ, সত্যিসত্যিই ওরা কি করছে ওখানে, কি ওদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান ইত্যাদি জেনে আসা। কিছুতেই একা কিছু করবার চেষ্টা কোরো না। একটা গোটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একা তোমার কিছুই করবার নেই। ক্ষতিকর কিছু দেখলে আমরা অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

'আর যদি ধরা পড়ে যাই, তবে?'

'বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ কোরো।'

'কোন রকম সাহায্যের ব্যবস্থা থাকছে না?'

'না। আপাতত সম্ভব হচ্ছে না।'

'কিন্তু ওদের আড্ডার ভেতর আমি ঢুকব কেমন করে?'

'সেটা এখানে বসে আমি কি করে বলি বলো? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তুমি নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মত। ওই যে, ওদের একটা মেয়ে স্পাই··· কি যেন নাম···ও, মিত্রা সেন। যার জন্যে এতগুলো ক্ষমতাশালী লোককে পুত্রহারা করলে তুমি—তার সঙ্গে তো তোমার খুব, মানে (বাম হাতের মধ্যমা দিয়ে ডান চোখের নিচটা একটু চুলকে নিলেন রাহাত খান), বেশ খানিকটা অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। তার কাছ থেকে কোন রকম সাহায্যের আশা আছে?'

'না, স্যার। ও একটু অন্য ধরনের মেয়ে। মানে,···'

'আচ্ছা, আচ্ছা। ও কেমন মেয়ে আমার না জানলেও চলবে। এদিকে ইয়ং টাইগারসের পিতৃদেবরা আমার মাথা চিবিয়ে খাবার চেষ্টা করছে। উঁচু মহলটা তোলপাড় করে ফেলেছে একেবারে। মহা ঝামেলায় পড়েছি। যাক, সেইদিন যদি শুভেচ্ছা মিশনের দলটাকে ধরতে পারতে, তবে আর এত ঝামেলা পোহাতে হত না।'

'ভোরে উঠে দেখছি ডাকবাংলো সাফ। নদীপথে পার হয়ে গেছে।'

'তোমার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।' অসমর্থন-সূচক মাথা নাড়লেন রাহাত খান।

এরপর অপারেশন গুডউইল সম্পর্কে আলোচনা হলো। কয়েকটা ম্যাপ এঁকে রাহাত খান কিসব বোঝালেন রানাকে। সব রকম সম্ভাবনাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হলো। তারপর এক সময় আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে এল রানা সে ঘর থেকে।

রাহাত খানের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে বসল রানা চিন্তিত মুখে। মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে ভবিষ্যৎ কাজগুলো।

'কি ব্যাপার? বড় সাহেব মেরেছে নাকি?' নাসরীন রেহানা সামনে এসে দাঁড়াল।

'মেরেছে মানে? একেবারে খুন করে ফেলেছে। কাল খবরের কাগজে দেখবে।'

'বুঝলাম না।'

'এখন বুঝে কাজ নেই। কাল কাগজ হাতে নিয়েই বুঝতে পারবে। এখন এই চিঠিটা নিয়ে নাভানা ট্রেডার্সে চলে যাও তো সোজা! ওদের শো-রুম থেকে যে রঙটা তোমার পছন্দ হয় সেই রঙের একটা করোনা নিয়ে চলে এসো। এখন থেকে টয়োটা গাড়ি চালাতে হবে আমার। যাও, নিয়ে এসো গাড়িটা।'

'টয়োটা করোনা?' দুই চোখ কপালে তুলল রেহানা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, করোনা। কানে কম শোনো নাকি? যাও ভাগো। আমার মেজাজ এখন তিন-চার রকম হয়ে আছে। ঘাঁটিয়ো না আমাকে।'

'ওরেব্বাপস্!' কেটে পড়ল রেহানা।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল মাসুদ রানা।

গ্রীন রোডের একটা ছোট্ট মোটর ওয়ার্কশপের সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামল লরেল গ্রীন মেটালিক কালারের একখানা আনকোরা নতুন টয়োটা সিডান। সামনে-পিছনে ON TEST লাগানো।

'আরে, আসুন আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম। বাঁচবেন অনেক দিন।' রানাকে দেখেই হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল দেওয়ান মটর ওয়ার্কসের এনামুল হক; পাতলা-সাতলা ছিমছাম চেহারা। কপালটা ক্রমেই বড় হয়ে যাচ্ছে—মাঝখানে কিছু চুল রেখে মাথার দুই পাশ দিয়ে এগোচ্ছে টাক। ডান গালে চোয়ালের কাছে কোন হাতুড়ে ডাক্তারের অপারেশনের দাগ, গর্ত হয়ে আছে। বাড়ি মুর্শিদাবাদ। রানার গাড়ির একমাত্র অভিভাবক।

'এ যে দেখছি নতুন গাড়ি। কোন বন্ধুর বুঝি?' করোনাটার দিকে একবার চেয়েই ঔৎসুক্য হারিয়ে ফেলল এনামুল হকের পাকা চোখ। অন্য কথায় চলে গেল সে।

'আপনার জাগুয়ারের পিস্টন রিং চেঞ্জ করে দিয়েছি, আর ধোঁয়া নেই। ট্যাপেট আর ডিসট্রিবিউটার এবার ঠিকমত অ্যাডজাস্ট হয়েছে, খেয়াল করেছেন?'

জাওয়ারের কথায় মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। ঘণ্টা দেড়েক পর নিজ হাতে ধ্বংস করতে হবে ওর একান্ত প্রিয় গাড়িটা। খবরটা জানতে পারলে রানার মতই আঘাত পেত এনামুল হক।

'গাড়িটা বন্ধুর নয়। আমার। এখন থেকে এটাই চালাতে হবে আমাকে। জাওয়ার বাদ।'

'জাগুয়ার বাদ? জাগুয়ার ছেড়ে এই গাড়ি চালাবেন আপনি?' তাজ্জব হয়ে গেল হক সাহেব।

'হ্যাঁ। ওপরওয়ালার হুকুম। তাই আপনার কাছে এটা নিয়ে এলাম। একটু মানুষ করে দিতে হবে।'

'তা করা যাবে, কিন্তু জাগুয়ারটা—ছি ছি ছি! আচ্ছা যাই হোক, কি আর করা।' গলাটা হঠাৎ উঁচু করে হাঁক ছাড়ল হক সাহেব, 'ও পিচ্চি, দিলু মিঞাকে বল মাসুদ সাহেব এসেছেন, ফাসকেলাস করে ডালপুরি আর চা। তাড়াতাড়ি করতে বলিস, বাবা।'

একটা চেয়ার হক সাহেবের খুব কাছে টেনে নিয়ে বসল রানা। তারপর ঘাড়ের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুলে করোনাটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এগুলো বোধহয় ঘণ্টায় আশি-পঁচাশি করে। না?'

'হ্যাঁ, তা ওইরকমই। এর বেশি আর কি আশা করেন?'

'কমপক্ষে একশো তিরিশ। পারবেন?'

'পারব না কেন? একটু সময় লাগবে। নতুন গাড়ি, মাত্র শো-রূম থেকে বের করেছেন, ক'দিন চালান, তারপর এক সময়—'

'নতুন গাড়ির মোহ আমার নেই, হক সাহেব, আপনি ভাল করেই জানেন। তাছাড়া আগামী কয়েকদিন আমি ঢাকার বাইরে যাচ্ছি। এটা আমি এখনই এখানে ছেড়ে ট্যাক্সিতে ফিরব বাসায়। ফিরে এসে কমপ্লিট চাই। কি কি বদলাতে হবে?'

'সে অনেক কিছু। প্রথমে তো চেসিস আর বডির ওজন কমাতে হবে; ইঞ্জিনের রোটেটিং আর রেসিপ্রোকেটিং পার্টসের ওজন কমাতে হবে। সিলিণ্ডার হেড মেশিনিং করে কম্প্রেশন রেশিও বাড়াতে হবে; ইনলেট পার্টগুলোকে হাই পলিশ লাগাতে হবে—যাতে ভাল ফ্লো পাওয়া যায়, কাস্ট আয়রন থাকলে ফ্লো অত সুবিধের হয় না; সাইলেন্সার বক্স উড়িয়ে দিয়ে ডাইরেক্ট একজস্ট পাইপ দিতে হবে; টুইন ডাউনড্রাফট কারবুরেটর লাগাতে হবে; (সিগারেটের প্যাকেট থেকে একখানা কিংস্টর্ক বের করল এনামুল হক) তাছাড়া কমবাসশন চেম্বারের ডিজাইন বদলে ফেলতে হবে; আরও শক্তিশালী ভ্যালভ স্প্রিং দিতে হবে; স্পেশাল ক্যামশ্যাফট ফিট করতে হবে; ট্যাপেট-ক্লিয়ারেন্স বাড়িয়ে দিতে হবে; ইনডাকশন র‍্যামিং এফেক্টের জন্যে সুপার চার্জার লাগাতে হবে। তার ওপর একখানা ওভার ড্রাইভ ইউনিট ফিট করে দেব—ইঞ্জিন স্পীড হুইল স্পীডের সমান হয়ে যাবে, পেট্রোলও খাবে অপেক্ষাকৃত কম। সাধারণ গাড়িতে ইঞ্জিন স্পীড হুইল স্পীডের ডবল থাকে—সমান করে দিলে, বুঝতে পারছেন না, কত বেশি স্পীড পাচ্ছেন? এছাড়া আরও দু'একটা টুকিটাকি জিনিস আছে। যেমন, কুলিং সিস্টেমটা ইমপ্রুভ করতে হবে, কারণ বুঝতেই পারছেন...'

'কিছু বুঝতে পারছি না,হক সাহেব,' আর সহ্য করতে পারল না রানা। 'এবং বুঝবার কিছুমাত্র আগ্রহও নেই। এসব আপনি বুঝলেই চলবে। স্পীড কত পাচ্ছি শুধু সেটাই বলেন, মশাই।'

'তা কমপক্ষে হানড্রেড টোয়েনটি তো বটেই। ঠিক কত পাবেন বলা মুশকিল। বেশিও হতে পারে।'

'ব্যস, তাহলেই খুশি। কিন্তু হবে তো?'

'হবে না কেন, বিদেশে হরদম হচ্ছে। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, যে রকম স্পীড আর পিক-আপ চাইছেন, তাতে পেট্রোল কনজাম্পশন বেড়ে যাবে অনেক।'

'তা হোক। এই দশ হাজার টাকার চেক রেখে যাচ্ছি—আরও যা লাগে লাগিয়ে দেবেন। এক হপ্তার মধ্যে আসছি আমি।'

'আরে সে-সব আমাকে বলতে হবে না। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, নিন আরম্ভ করুন।'

রানার প্রিয় ডালপুরি—দিলুর নিজ হাতে তৈরি—আর চা শেষ করে সিগারেট ধরাল এনামুল হক। ঠিক এমনি সময় ঢুকল এসে ইদু মিঞা।

'ওস্তাদ, আমার গাড়িটা আবোর ফির টেরাবোল দিতাছে। ইকজিরিসা দেইখা দিবার লাগব।' হঠাৎ রানার দিকে চোখ পড়তেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ইদু মিঞা। 'আরে আপনে এইখানে, হুজুর! ওস্তাদের লগে জান-পয়চান আছে বুজি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, জান পয়চান আছে। আয় দেখি তোর গাড়ির কি হয়েছে!' ধমকের সুরে বলল হক। তারপর তিনজন এসে দাঁড়াল ট্যাক্সির সামনে। 'দে, স্টার্ট দে দেখি!'

ইদু মিঞা স্টার্ট দিল কিন্তু কোন ট্রাবল পাওয়া গেল না। রানা একটু অবাক হলো।

'ব্যাটা শয়তান, এই রাস্তা দিয়ে যখনই যাবে, নেমে এসে এরকম বিরক্ত করবে। কিছু না, ঠিক আছে গাড়ি।' রানার দিকে চেয়ে বলল, 'এটা ওর একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই পথে যেতে একবার থামা চাই।'

'আরে না না, ওস্তাদ। আপনেরে দেখলেই হালায় টেরাবল যায় গা।'

হাসে ইদু মিঞা। 'আহেন হুজুর, কোন্ দিকে যাইবেন?' রানাকে ডাকল এবার সে।

'তোমার গাড়িতে উঠব না।'

'কেন্‌গো হুজুর, ব্যাদ্দবি হইছে কোন?'

'না। ভাড়া না নিলে তোমার গাড়িতে আর ওঠা যাবে না।'

'কি কন, হুজুর। বারার লগে কি? দিলে দিবেন, না দিলে না দিবেন। মাগার বেইনসাফ দিবার পারবেন না। পুরানা পল্টন থেইকা এয়ারপোর্ট—ঘ্যাচ কইরা বিশটা ট্যাকা বাইর কইরা দিলেন। পাঁচ ট্যাকা বি কেরায়া অহে না। বেইমান পাইছেন আমারে?'

'আর এদিক-ওদিক যে ঘুরলে?' গাড়িতে উঠে বসে বলল রানা।

'গুরলাম তো বেহুদা, হুজুর। আপনে বি চুপ থাকলেন। আই.বি. লাগছে মনে কইরা খামাখা দৌর পারলাম।' গাড়ি ছেড়ে দিল ইদু মিঞা। রানা হাত নাড়ল

এনামুল হকের দিকে।

'মতিঝিল। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন।'

কথার খেই ধরে আবার আরম্ভ করল ইদু মিঞা।

'উই হালার পিছে লাগছিলাম আমি এয়ারপোর্ট থেইকা, দেখি হালায় যায় কই। আই.বি. না কচু উইটা। ভাগতে ভাগতে এক্কেরে রমনা পার্ক। গাড়ি ফালায়া গেল গা হালায়। আমি...'

'আজ রাত তিনটের সময় আমার বাসায় আসতে পারবে?'

'পারুম না কেলেগা? মাহাজনের গাড়ি তো না, আপনা গাড়ি।'

'বেশ, এসো তাহলে।'

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা সাততলা বাড়িটার মধ্যে। ভাবল ভোর রাতে ইদু মিঞাকে বলে দেবে যেন আগামী কাল একবার এনামুল হকের সঙ্গে দেখা করে দুপুরের দিকে। নিশ্চয়ই এনামুল হক ওকে রানার মৃত্যু-সংবাদ দেবে—তারপর অবাক হয়ে শুনবে ভোর রাতে রানার ঢাকা ত্যাগের কথা। ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে চেপে যাবে হক সাহেব। কাজ বন্ধ করবে না করোনার। ক'দিন পর ঢাকায় ফিরে তৈরি গাড়ি পাবে সে।

নয়

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

রেঙ্গুনে দুই ঘণ্টা থামতে হবে। পি.আই.এ.-র দৌড় ওই পর্যন্তই। এরপর বিওএসি-তে যেতে হবে ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্ককযাত্রীরা বেশির ভাগই বেরিয়ে পড়ল ভোরের রেঙ্গুন দেখতে। একা রানা বসে থাকল প্যাসেঞ্জারস লাউঞ্জে। ঢাকা এয়ারপোর্টে কেনা আজকের বাংলা কাগজটা খুলল মাসুদ রানা। এতক্ষণ প্লেনে ওটা ভাঁজ করে নিয়ে বসেছিল, খুলতে সাহস হয়নি, পাছে কেউ চিনে ফেলে।

খবরের কাগজে পরিষ্কার উঠেছে ছবিটা প্রথম পৃষ্ঠায়। ভাঙাচোরা জাগুয়ার গাড়িটার দুমড়ানো দরজা দিয়ে বেরিয়ে আছে রানার দেহের অর্ধাংশ। রক্তে (লাল কালিতে) ভেসে গেছে কপাল, গাল, জামার একাংশ। কিন্তু চেনা যাচ্ছে রানাকে। হেডিং—'সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু।' নিচে লেখা:

(নিজস্ব সংবাদদাতা)
গতকল্য বৃহস্পতিবার বৈকাল সাড়ে-ছয়টায় চন্দ্রার
নিকট, গাছের সহিত ধাক্কা খাইয়া একটি জাগুয়ার
গাড়ি, ই, বি, এ, ৪৭৮৪, সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত
হইয়া চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হইয়াছেন।
বেপরোয়া গতিতে গাড়িটি ঢাকা হইতে আসিতেছিল।
পথের উপর ক্রীড়া রত দুইটি বালককে
রক্ষা করতে গিয়া ডান দিকে কাটিয়া গাড়িটি
একটি গাছের সহিত ধাক্কা খাইয়া চুরমার হইয়া

যায়। নিহত চালক জনাব মাসুদ রানা ঢাকার
ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশনের ম্যানেজার
ছিলেন। ময়না তদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল
কলেজ হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রানা ভাবল সত্যিই যদি ওর মৃত্যু ঘটত তাহলেও ঠিক এমনি নিরুত্তাপ ভাষায় লাইন ক'টা লেখা হত। তারপর ভুলে যেত সবাই ওর কথা। নতুন নতুন মানুষ আসত এই পৃথিবীতে—ঢেউয়ের পর ঢেউ আসত নতুন জেনারেশন—হাজার হাজার বছর পার হয়ে যেত। তেমনি চাঁদ উঠত আকাশে দুনিয়াটাকে স্নিগ্ধ আলোয় মায়াময় করে দিয়ে, তেমনি সাগর দুলত আবেগে, মাতাল হাওয়া এসে নিবিড় করে তুলত বিরহ বেদনা। তরুণ তার স্বপ্নের রঙে রাঙিয়ে নিত এই ভুবন; যৌবনের গর্বে বুক ফুলিয়ে বলত 'আমি ভালবাসি, ভালবাসি এই সুন্দর পৃথিবীকে।' তারপর একদিন সে-ও হারিয়ে যেত রানার মতন কালের অতলে। মানুষের জীবনটা কী!

মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে এসব বাজে চিন্তা দূর করে দিল মাসুদ রানা। যতক্ষণ বেঁচে আছে অন্তত ততক্ষণ তো সে স্বেচ্ছাধীন। তার ইচ্ছের ঘোড়া যেদিক খুশি ছোটাতে পারে—কাল-মহাকালের থোড়াই পরোয়া করে সে! তারপর যা হবার হোক না, কে মানা করতে গেছে।

লাগাও ব্রেকফাস্ট। তারপর আবার প্লেন। পাহাড় পর্বত পেরিয়ে ব্যাঙ্কক।

ব্যাঙ্ককে কাস্টমস চেকিং শেষ হতেই বেরিয়ে এল রানা। মৃদু হেসে ভাবল, ওর অ্যাটাচি কেসটা দেখলেই হয়েছিল কাজ। পঞ্চাশটা একশো ডলারের কড়কড়ে নোট ছিল একটা চোরা পকেটে। কাউকে না জানিয়ে এগুলো এনেছে সে হোম ডেলিভারি স্কিমে এক বন্ধুর জন্যে কিছু শখের জিনিস কিনে পাঠাবে বলে।

'মিস্টার মাসুদ রানা?' গগলস আঁটা এক ভদ্রমহিলা কাছে এসে দাঁড়াল। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ হবে। গায়ের রঙ রীতিমত ফর্সা। চমৎকার স্বাস্থ্য। বোধহয় অ্যাংলো-থাই হবে। নাক মুখের চেহারা অপূর্ব বলা যাবে না। চীনা টাইপ। কিন্তু চমৎকার একপাটি ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল মেয়েটি।

'ইয়েস।'

'দিস ইজ ক্যাথি ডেভন। গ্ল্যাড টু মিট ইয়ু।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইয়ু,' উত্তর দিল রানা।

'আপনার জন্যে গাড়ি তৈরি। আসুন আমার সঙ্গে। ব্রিস্টল হোটেলে আপনার জন্যে রুম রিজার্ভ করা আছে। মি. ক্রিয়াং শ্রীসানান জরুরী কাজে সায়গন গেছেন। আমার ওপর আপনার ভার পড়েছে। আশা করি প্লেনে সময়টা ভালই কেটেছে।'

'নাহ্। খুব খারাপ! পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে আসবার সময় এত বাম্প করেছে যে মাথাটা ঘুরছে এখনও। ভাবছি পায়ে হেঁটে দেশে ফিরব।'

'আপনার দুর্ভাগ্য। আজ বোধহয় আবহাওয়া কিছু গোলমাল করেছে। সাধারণত এমন অনুযোগ শোনা যায় না।'

একটা স্যাণ্ড বীজ কালারের এইট-ফিফটি ফিয়াট দাঁড়িয়ে ছিল, ড্রাইভিং সীটে

বসে ভেতর থেকে ওপাশের দরজাটা খুলে দিল ক্যাথি ডেভন। ছোটখাটো টু-ডোর গাড়িটা বেশ পছন্দ হলো রানার। উঠে বসল পাশের সীটে। গাড়ির ওই সীটটাকে ডেথ সীট বলে—কোন এক আমেরিকান ম্যাগাজিনে পড়েছিল। একটু মুচকে হাসল রানা।

পাকা হাত মেয়েটির। যখন ডান দিকে মোড় ঘুরবে তখন ঠিক ডানদিকেই সিগন্যাল দিচ্ছে; বেশিরভাগ মেয়ে ড্রাইভারের মত বাঁয়ে সিগন্যাল দিয়ে ডাইনে ঘুরছে না। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে চলল রানা। পীচ ঢালা রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েক মাইল গিয়ে শহরে ঢুকল গাড়ি। একেবারে বাংলাদেশের মত দেশটা। কিন্তু অনেক দ্রুত এখানকার জীবন-যাত্রা। শহরের মধ্যে অসংখ্য খাল—ফলে, অসংখ্য কালভার্ট। প্রচুর আমেরিকান মুখ দেখা গেল। সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে এটা ওটা চেনাতে চেনাতে এগিয়ে চলল ক্যাথি ডেভন। চারতলা ব্রিস্টল হোটেল। তিনতলায় রানার ঘর।

'বিকেলে আমাদের মেক-আপ ম্যান এসে আপনার চেহারা পাল্টে দিয়ে ফটো তুলে নিয়ে যাবে। মি. ক্রিয়াং প্রীসানান সব ব্যবস্থা করে গেছেন। কাল আপনার নতুন পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন দশটার ভেতর। আপনি আপনার ঘরে বিশ্রাম নিন। টেলিফোন আছে, যা লাগবে রুম-সার্ভিসে বলে দেবেন, সোজা আপনার ঘরে চলে আসবে।'

'দুপুরের লাঞ্চটা কোথায় সারা যায় বলুন তো? আসুন না এক সঙ্গেই লাঞ্চ করা যাক?' রানা বলল।

একটু ইতস্তত করে ক্যাথি বলল, 'ঠিক আছে। আমি ক'টা কাজ সেরে চলে আসছি ঘন্টা খানেকের মধ্যে।'

ক্যাথি ডেভন চলে যেতেই রানা স্নান সেরে নিল। ইজি চেয়ারে শুয়ে এক কাপ কফি অর্ডার দিয়ে আবার বাংলা কাগজটা খুলল। চুরি, নৃশংস ভাবে স্ত্রী-পুত্র হত্যা, মোহামেডান স্পোর্টিং-এর ৩-০ গোলে জয়লাভ, ভিয়েৎকং সৈন্যদের গুলিতে তিনটি মার্কিন বিমান ভূপাতিত, প্রেসিডেন্টের পিণ্ডি প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি শেষ করে বিজ্ঞাপনগুলোর ওপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে আর একবার নিজের মৃত্যু-সংবাদটা পড়ল। হাসি পেল ওর।

এনামুল হক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ইদু মিয়ার কাছ থেকে খবর পেয়ে টয়োটা করোনার কাজ শুরু করে দিয়েছে। রাহাত খান মোটা হাভানা চুরুট ধরিয়ে কাজে মগ্ন। রেহানা রানার অবর্তমানে রানার সহকর্মী জাহেদ ইকবালের ডিক্টেশন লিখছে শর্ট হ্যাণ্ডে। পলাতক কবীর চৌধুরীর মনটা খারাপ হয়ে যাবে নিজ হাতে রানাকে শেষ করতে পারল না বলে। চিটাগাং-এর আবদুল হাই, কুষ্টিয়ার সোহেল এরা চমকে উঠবে। ভাববে—আহা, ব্যাটা নেহাত খারাপ লোক ছিল না। জয়দ্রথ মৈত্র ঠোঁটের কোণের ঘা চেটে নিয়ে হাসবে তার বীভৎস হাসি। আর মিত্রা? দুঃখ পাবে? খুশি হবে?

মিত্রার মনের অবস্থাটা ঠিক কল্পনা করতে পারল না রানা। ওর জটিল মনের মধ্যে রানার জন্যে কতখানি দুর্বলতা আছে তা জানা সম্ভব হয়নি রানার পক্ষে। দেশ-প্রেম ওর কাছে অনেক বড়। হিন্দুসমাজ সংস্কারের প্রতি গভীর অনুরক্তি, অথচ ডাল

লেগেছে এক বিদেশী মুসলমানকে। রানার মৃত্যু সংবাদে হয়তো মিত্রা হাঁফ ছেড়ে বেঁচে যাবে। নিজের দেশ, নিজ আত্মীয়স্বজন, সমাজ, এতদিনকার মজ্জাগত সংস্কার, সব ত্যাগ করে নতুন জীবনে ঝাঁপ দেয়ার দ্বন্দ্ব থেকে তো অন্তত মুক্তি পেল।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রানা ভাবল মানুষের কাজ না থাকলে বোধহয় এসব বেহুদা চিন্তা মাথার মধ্যে কিলবিল করে। সে এসব কি ভাবছে? জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল সে আনমনে।

'ব্যাক গিয়ারটা কোন্ দিকে?' ড্রাইভিং সীটের নিচে লিভারটা ডান দিকে চাপ দিয়ে সীটটা কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অন্যান্য গিয়ার জানেন তো? ব্যাক হচ্ছে চেপে নিচু করে ফোর্থ গিয়ার।'

সাঁ করে বেরিয়ে গেল রানা হোটেল থেকে ক্যাথি ডেভনকে নিয়ে।

'লাঞ্চের আগে আমি একটু বাসা হয়ে যেতে চাই। বাড়ির কাউকে বলা হয়নি, ওরা অপেক্ষা করবে। দু'মিনিট লাগবে আমার।' লজ্জা পেল ক্যাথি একটু।

'তাতে কি আছে—চলুন না। আপনি শুধু ডাইনে-বামে বলে দেবেন। বাড়িতে টেলিফোন নেই বুঝি?'

'না, এখন আর নেই। এখন আমরা খুব গরীব হয়ে গেছি।'

'গাড়িটা আপনার না?'

'আমার হবে কেন? অফিসের। আমার হলে তো এক্ষুণি বেচে দিতাম।'

'কেন?'

চট করে অন্য কথায় চলে গেল ক্যাথি। রানা বুঝল ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি। পাঁচ মিনিট পর একটা সরু গলির ভিতর ঢুকল গাড়িটা। একটা পুরানো ইঁট বের করা, প্লাস্টার খসে পড়া বাড়ির সামনে থামল গাড়ি। রাস্তার পাশে কল থেকে পানি নেবার জন্যে লাইন লেগে গেছে। বালতি-হাতে একটা ছোট্ট অর্ধ-উলঙ্গ মেয়েকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল ক্যাথি, 'বাবা কি করছে রে? মেজাজ কি রকম?'

'এই রকম!' চোখ মুখ পাকিয়ে একটা ভঙ্গি করে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। তারপর অবাক, বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখতে থাকল। অপলক দৃষ্টি।

'আমার বোন,' বলল ক্যাথি রানাকে। 'আপনি গাড়িতে বসুন এই ইলেকট্রোফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে, আমি এক্ষুণি আসছি।'

'আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না?'

একটু ইতস্তত করল ক্যাথি, তারপর ডাকল।

নোংরা ঘর। মেঝেটা খাওয়া খাওয়া। খুবই সস্তা দরের কয়েকটা কাঠের চেয়ার, তাও আবার কোনটার হাতল ভাঙা, কোনটার পা মচকানো। একটা ময়লা পর্দা ঝুলছে দরজায়।

হঠাৎ সেই দরজা দিয়ে একটা ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে এক হাতে চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে একজন বৃদ্ধ এসে ঢুকল ঘরে। ক্যাথি পরিচয় করিয়ে দিল বাবার সঙ্গে। এক ফোঁটা হাসি নেই বৃদ্ধের মুখে। গম্ভীর মুখে তীক্ষ্ণ দুটো সন্দেহপূর্ণ চোখ মেলে আপাদমস্তক লক্ষ করল বৃদ্ধ রানাকে। রানার পরিচয় যে সে একবিন্দু বিশ্বাস

করল না তা স্পষ্ট বোঝা গেল। অস্বস্তি লাগছে রানার। ক্যাথি বলল, 'আমরা দুপুরে বাইরে খাচ্ছি আজ, তাই বলতে এলাম।'

হঠাৎ বৃদ্ধ পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল ক্যাথিকে, 'এতক্ষণ এই লোকটার সঙ্গে ছিলে তুমি? একে চেনো তুমি যে বিয়ে করতে যাচ্ছ?'

চমকে উঠল রানা। ফ্যাকাসে হয়ে গেল ক্যাথি ডেভনের মুখ। শুধু বলল, 'বাবা!'

'ন্যাকামী কোরো না। ভেবেছ আমি কিচ্ছু টের পাই না? শয়তান মেয়ে! বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছ! বাপ-মা-ভাই-বোন কিচ্ছু না? দূর হ তুই আমার বাড়ি থেকে। তোর টাকা না খেলেও চলবে আমার।' এবার রানার দিকে অগ্নি-দৃষ্টি ফেলল বৃদ্ধ, 'আর তুমি, হারামজাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? জামাই হতে এসেছ? মনে করেছ কোলে বসিয়ে দুই গালে চুমু দেব সকাল-বিকেল? জানো, তোমাকে পুলিসে দেব আমি! বদমাইশ, সর্বনাশ করতে এসেছ আমাদের!'

দুই হাতে চোখ ঢেকে কেঁদে ফেলল ক্যাথি। এমন সময় একজন প্রৌঢ়া থাই ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকল। রানা এবং ক্যাথির দিকে এক নজর চেয়েই ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে বলল, 'অ্যাই, আবার তুমি বাইরের ঘরে এসেছ?' ইনভ্যালিড চেয়ারটা ঠেলে পাশের ঘরে নিতে নিতে রানার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি দয়া করে কিছু মনে করবেন না, মি…'

রানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল বুড়ো চিৎকার করে বলছে, 'সবাই জোচ্চোর, সব শয়তান! আমি এদের চিনি না মনে করেছ? এখন আমাদের কি অবস্থা হবে? বিয়ে করলে আর টাকা দেবে ক্যাথি?'—গলাটা ভেঙে গেল। কাঁদতে আরম্ভ করল বৃদ্ধ। 'এত বড় সংসার নিয়ে এবার পানিতে ভাসলাম রে…'

মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'চুপ করো! আহ্ চুপ করো তো, লক্ষ্মী। ক্যাথি বিয়ে করছে কে বললে তোমাকে? ছি ছি, ওই ভদ্রলোকের সামনে তুমি মেয়েটাকে কত বড় অপমান করলে বলো তো!'

'ভদ্দোরনোক! উহ্! পরিষ্কার ডাকাতের চেহারা। সে আবার ভদ্দোরনোক সাজতে এসেছে…'

রুমালে চোখ মুছে নিয়ে ক্যাথি বলল, 'মাফ করবেন, মি. রানা। আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি মাকে বলেই চলে আসছি।'

হতবাক রানা গাড়িতে গিয়ে বসল। ঠিক দু'মিনিটেই চলে এল ক্যাথি। লাবন্ লুয়াং রোডের রেইনবো হোটেলে ইংলিশ লাঞ্চ অর্ডার দিল রানা।

সুপের মধ্যে গোল মরিচের গুঁড়ো ফেলতে ফেলতে রানা বলল, 'আপনার বাবার এই অবস্থা কতদিন ধরে?'

'কি অবস্থা?'

'এই, মানে, একটু অপ্রকৃতিস্থতা…'

'আমার বাবা পাগল নন। উনি ভুগছেন সন্দেহ রোগে। আর এই রোগও আরম্ভ হয়েছে অল্পদিন ধরে। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ায় ওঁর মস্ত ব্যবসা বন্ধু-বান্ধব, পার্টনার আর কর্মচারীরা মিলে উচ্ছন্নে দিয়েছে। অনেক টাকা ধার হয়ে গেল

বাজারে। সেই থেকে সবাইকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন উনি। আমি আর আমার এক বোন উপার্জন করে সংসার না চালালে সবাই না খেয়ে মারা যাবে। তাই ওঁর সন্দেহ আমরা নিজের সুখের জন্যে স্বার্থপরের মত বিয়ে করে ফেলব, এবং সংসারে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে। সব সময় এ অবস্থা থাকে না। প্রত্যেক মাসের প্রথমে যখন টাকা তুলে দিই বাবার হাতে, বাবা তখন ছেলেমানুষের মত হাউ-মাউ করে কাঁদে। বলে—তোদের আমি নিংড়ে শুষে ছোবড়া বানিয়ে ফেলছি রে, ক্যাথি। দোহাই তোদের, আমাকে একটু বিষ এনে দে। আমি মরলেই তোরা সুখে সংসার বাঁধতে পারবি।' হঠাৎ সচকিত হয়ে ক্যাথি বলল, 'ছি ছি, আপনাকে এসব কি বলছি!'

'আমার কিন্তু শুনতে বেশ লাগছে। আপনার বাবা কি এদেশের…'

'উনি আইরিশ। আমার মায়ের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে এখানেই সেট্‌ল্ করেছিলেন। তাই আমরা হয়েছি এক মিশ্র জাত। ধর্ম আমাদের ক্রিশ্চানিটি। সমাজে স্থান নেই। সবাই "অ্যাংলো" বলে মুখ বাঁকায়।'

'আপনার বোনও কি চাকরি করেন?'

'না সে নৃত্য-শিল্পী। ঠিক শিল্পী বলা যায় না। নেচে টাকা উপার্জন করে আর কি। কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে আছে সে এখন। নেচে যা পায় খরচটা রেখে সব পাঠিয়ে দেয় বাবার কাছে। আমাদের বোধহয় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা উচিত। এসব দুঃখের কথা আপনি শুনে কি করবেন?'

পুডিং শেষ হতেই কফি এল। কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে রানা বলল, 'আপনার ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি?'

'ভবিষ্যতের চিন্তা একদম বন্ধ করে দিয়েছি।'

'কেন?'

'আমরা যে পাঁকে পড়েছি, এ থেকে বেরোতে আরও দশ বছর লাগবে। আমার বয়স কত জানেন? দেখলে অনেক কম মনে হয়, আসলে বত্রিশ। দশ বছর পর বয়স হবে বেয়াল্লিশ। তারপরেও কি আর কোন ভবিষ্যৎ থাকতে পারে মেয়েমানুষের? প্ল্যান করে লাভ আছে কোন? আমার জন্যে অনন্তকাল তো আর অপেক্ষা করতে পারবে না উইলিয়াম!'

'দশ বছর কেন?'

আমরা দু'বোন সমস্ত সংসার খরচের পর গড়পড়তা একশো ডলার করে জমাচ্ছি প্রতিমাসে। আড়াই বছরে তিন হাজার ডলার জমিয়েছি আমরা। যখন আরও বারো হাজার জমাতে পারব তখন আমাদের সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে। এই রাস্তার ওপরেই আমাদের একটা ছয়তলা বাড়ি আছে। সেটা মর্টগেজ মুক্ত হয়ে যাবে। সে বাড়ির ভাড়াই মাসে এক হাজার ডলার—আবার বড়লোক হয়ে যাব আমরা। কিন্তু তখন আমাদের আর বয়স থাকবে না সে-সুখ উপভোগ করবার।' ম্লান হাসি ফুটে উঠল ক্যাথির পাতলা ঠোঁটে।

'আচ্ছা এতবড় দায়িত্বের বোঝা ইচ্ছে করলেই তো কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজে সুখী হতে পারেন আপনি। কেন আপনি নিজের জীবনটা…'

'ওকথা বলবেন না।' দুই হাতে কান ঢাকল ক্যাথি। 'ওকথা শোনাও পাপ।

অনেকে বলেছে, এমন কি উইলিয়ামও। ভুলেও যদি করে বসি একাজ—তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে আত্মহত্যা।'

'কোনও আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার পাওয়া সম্ভব নয়?'

'না। সে চেষ্টা করেছি।'

'তবে তো দেখছি আপনার সুখের সব দরজা বন্ধ।'

'হোটেলের দরজা তো আর বন্ধ নয়। বেলা অনেক হয়েছে। চলুন, আপাতত ওই দরজা দিয়ে বেরোনো যাক।' হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল ক্যাথি। রানার মনে পড়ল ঠিক এমনি করেই হাসে ক্যাথির দশ বছরের অর্ধ-উলঙ্গ দুষ্টু বোনটা। 'এবং ধন্যবাদ। আপনাকে সব কথা বলে নিজেকে অনেক হালকা লাগছে এখন।'

বিকেলে মেক-আপ ম্যান এসে আধ ঘন্টা পরিশ্রম করল রানার মুখের ওপর। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অন্য একটা লোককে দেখতে পেল রানা। মোটামুটি মঙ্গোলিয়ান চেহারা দাঁড়িয়েছে।

'উঠিয়ে না ফেললে এই দাগ হপ্তাখানেক থাকবে। তারপর প্রয়োজন হলে আবার এক পোচ বুলিয়ে নেবেন। ক্যামিক্যালসের শিশি দুটো রেখে যাচ্ছি।' উঠে দাঁড়াল লোকটা। তারপর রানার একটা ফটো তুলে নিল। 'এটা পাসপোর্টে যাবে। আপনার নাম চরোসা থিরা। থাই আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ইণ্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

লোকটা বেরিয়ে যেতেই এসে ঢুকল ক্যাথি ডেভন।

'বাহ্, চমৎকার হয়েছে। এখন তৈরি হয়ে নিয়ে চলুন দেখি, আপনার জন্যে সুটকেস, জামা-কাপড়, সবকিছু নতুন করে কিনতে হবে। আপনার এই থ্যাবড়া সুটকেস ফেরত যাবে পাকিস্তানে।'

কাপড়চোপড়, জুতো-মোজা, টাই-টাইপিন, ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসপত্র কিনে সন্ধ্যার সময় ফিরল ওরা হোটেলে। ক্যাথি চলে যাচ্ছিল কাল দেখা হবে বলে, কিন্তু রানা ওকে যেতে দিল না।

'আজ সন্ধেটা আমার সঙ্গে কাটাতে হবে, মিস ডেভন। কাল দশটার পর কোথায় আমি আর কোথায় আপনি। জীবনে আর দেখা হবে না। আমার অনুরোধটা দয়া করে ফেলবেন না।' রানার মুখে উজ্জ্বল হাসি।

অবাক দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল একবার ক্যাথি। নাহ্। কোন খারাপ মতলব আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কি ভেবে রাজি হয়ে গেল। মুখে বলল, 'কিন্তু আটটার বেশি থাকতে পারব না। বাড়ির অবস্থা তো দেখেই এসেছেন।'

গাড়িতে উঠে রানা বলল, 'এখানকার সবচেয়ে নাম করা ক্যাসিনো কোনটা? সবচেয়ে উঁচু স্টেকে খেলা হয় যেখানে?'

ক্যাসিনো কথাটা বোধহয় বুঝল না ক্যাথি, কিন্তু উঁচু স্টেকে খেলার কথা শুনে বুঝল জুয়া খেলার কথা হচ্ছে। বলল, 'ডায়মণ্ড হাউস।'

'কোথায় সেটা?'

'সুরায়োং রোডে। আমি ঢুকিনি কখনও ভেতরে। কেন?'

'চলুন ডায়মণ্ড হাউসেই কাটাই আজ সন্ধেটা।'

বিরাট ক্যাসিনোর চকচকে মোজাইক করা মেঝে। এন্ট্রি ফি দিয়ে দোতলায় উঠে এল ওরা। চারদিকে নানান রকম খেলার ব্যবস্থা। সুন্দরী থাই মেয়েদের সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় প্রচুর আমেরিকান বসে আছে। Chemin de fer এবং Caisse-র পাশ কাটিয়ে ওরা একটা কোণের খালি টেবিলে গিয়ে বসল। নিজের জন্যে একটা কোক এবং ক্যাথির জন্যে অরেঞ্জ স্কোয়াশ অর্ডার দিল রানা।

একটু সামনে ঝুঁকে রানা বলল, 'আমি একজন পাকা জুয়াড়ি। খুব খারাপ লোক, সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ আমার খেলতে ভয় করছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি আজ আমার ভাগ্য সহায়তা করবে না। খেললে ঠিক হেরে যাব। আমাকে একটু সাহায্য করবেন আপনি?'

'আমি জীবনে এসব খেলিনি। তাছাড়া এসব পছন্দও করি না। চাকরি খোয়াবার ভয় না থাকলে কিছুতেই আপনার সঙ্গে এখানে ঢুকতাম না। এখন বলুন, কি সাহায্য করতে হবে।' একটু বিরক্তি ক্যাথির কণ্ঠে।

'খুব সোজা খেলা। আমার হয়ে আপনাকে একটু খেলতে হবে।'

'বললাম তো, আমি এসব খেলা জানি না।'

'আপনার কোন চিন্তা নেই। শিখিয়ে দেব। আমি যা বলব আপনি শুধু তাই করবেন। এই নিন চার হাজার ডলার। রুলেত খেলতে হবে আপনাকে।'

বিস্মিত ক্যাথি বলল, 'বাব্বা, এত টাকা! যদি হেরে যাই?'

'ব্যাপারটা আগে আপনাকে বুঝিয়ে বলি।' নোটগুলো ক্যাথি ডেভনের হাতে দিয়ে রানা বলল, 'এই টাকা আপনাকে ধার দিচ্ছি, কারণ ধার না দিলে আমার আজ রাতের মন্দ ভাগ্যের আওতা থেকে রেহাই পাবে না টাকাগুলো। আমরা, পাকা জুয়াড়িরা, সৌভাগ্য এবং মন্দ-ভাগ্যের অদৃশ্য হাত উপলব্ধি করতে পারি এক আশ্চর্য শক্তির বলে। এবং মেনে চলি। যেই ধার দিয়ে দিলাম, অমনি এই মুহূর্ত থেকে ওই টাকা আমার না। বুঝেছেন? কিন্তু যাতে হেরে গেলে ওই ধার আপনাকে আবার শোধ করতে না হয় সেজন্যে টাকাটা কোথায় কি ভাবে খেলতে হবে সেটা আমি আপনাকে বলে দেব। হারলে আমার দোষে হারবেন, আপনি দায়মুক্ত। বুঝতে পেরেছেন?'

'কত প্যাঁচ! জুয়াড়িদের নানান কুসংস্কার থাকে জানতাম—কিন্তু আপনার মধ্যেও...' হাসল ক্যাথি। 'বেশ, এখন বলুন কি করতে হবে।'

রুলেত টেবিলের সামনে অল্প লোকের ভিড় ছিল। রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখানকার সবচেয়ে উঁচু স্টেক কত?'

'আনলিমিটেড! যত খুশি খেলতে পারেন।' নিরুৎসুক কণ্ঠে কাঠিহাতে লোকটা জবাব দিল।

'মিস ডেভন, টাকাগুলো ক্রুপিয়েই-এর (Croupier) কাছে দিয়ে কালোয় খেলুন।'

'সব একসঙ্গে?' অবাক হয়ে যায় ক্যাথি।

'হ্যাঁ, সব।'

চার হাজার ডলার দেখে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ক্রুপিয়েই-এর। চটপট গুণে

নিয়ে আড়চোখে দেখে নিল একবার রানাকে। নোটগুলো টেবিলের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়ে চল্লিশটা লাল 'প্লেক' নিয়ে কালো ঘরে রাখল। আরও কয়েকজন অল্প-স্বল্প স্টেক ধরল। টেবিলের তলায় হাত ঢোকাল একবার ক্রুপিয়েই, রানা বুঝল, কোথাও একটা বেল বেজে উঠল নিশ্চয়ই। যেন হাওয়ায় ভেসে দু'জন ষণ্ডা মত লোক এসে দাঁড়াল টেবিলের পাশে। ঘুরিয়ে দেয়া হলো থালাটা। হাতির দাঁতের ছোট্ট সাদা বলটা ছুটে বেড়াতে লাগল থালাময়।

রানা চেয়ে দেখল ক্যাথি একদৃষ্টে চেয়ে আছে থেমে আসা থালাটার দিকে। কি করে জানি রানা জানত, জয় অনিবার্য। মৃদু হাসল সে।

'থারটিন। ব্ল্যাক। লো অ্যাণ্ড অড।' উঁচু গলায় বলল কাঠিধারী।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্যাথির চোখ। রানার দিকে চাইল সে। এক বস্তা লাল 'প্লেক' জমল ক্যাথির পাশে। মোট আশিটা হলো।

'আবার চল্লিশটা দিন কালোয়।'

কাঠি দিয়ে 'প্লেক'-গুলো কালোয় রাখা হলো একবার গুণে নিয়ে। আবার থেমে এল থালাটা। আশপাশে লোক জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। হাতির দাঁতের বলটা এঘর ওঘর টপকে গিয়ে একটা ঘরে থামল।

'টোয়েনটি। ব্ল্যাক। হাই অ্যাণ্ড ইভেন।'

বাচ্চা মেয়ের মত আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল ক্যাথি ডের্ভন। অদ্ভুত এক অনাস্বাদিতপূর্ব উত্তেজনা অনুভব করছে সে। নেশায় পেয়ে বসেছে যেন ওকে। জিজ্ঞেস করল, 'এবার?'

'এই দানটা আমরা খেলব না,' বলল রানা। অবাক হয়ে ক্যাথি এবং ক্রুপিয়েই চাইল রানার দিকে। মাথা নাড়ল রানা। রানার ভেতর থেকে কে যেন বলে দিল, অপেক্ষা করো।

আশেপাশে সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। এতক্ষণ যারা দশ-বিশ ডলার খেলছিল, রানার জেতা দেখে তারাও স্টেক বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ-ত্রিশ, কেউবা পঞ্চাশ। জমে উঠেছে খেলা। লোকে ভিড় করতে আরম্ভ করল এই টেবিলে। আবার ঘুরল থালা।

থালা থামতেই রানা দেখল ছোট্ট বলটা পড়ল গিয়ে সবুজ দুটো ঘরের একটায়। বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল একবার। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সে।

স্টিক-ধারী চিৎকার করে বলল, 'ডাবল জিরো!' তারপর কালো-লাল সব ঘরের প্লেকগুলোই তুলে নিল টেবিল থেকে।

'এবার রেড,' রানা হাসল ক্যাথির দিকে চেয়ে।

'কত?' ডাবল জিরো দেখে ভয় ধরে গিয়েছে ক্যাথির। বুকের ভিতরটা ওর কেঁপে উঠল একবার রানা যখন বলল, চল্লিশ।

বেশ লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে এবার। কানাঘুষো হচ্ছে ওদের নিয়ে। ক্যাথির হাত থেকে প্লেকগুলো নিয়ে লালে রাখল কাঠিধারী। আবার ঘুরল থালা। রানা টের পেল কিছু উৎসুক চোখ লক্ষ্য করছে ওর মুখ। নিরাসক্ত ভাবে চেয়ে রয়েছে থালার দিকে। কিন্তু ভিতর ভিতর একটু উত্তেজিত না হয়ে পারল না রানা। প্রতিবারই কি ভাগ্য তার সহায় হবে? এইবার খেলা কি উচিত হলো?

থালাটা যখন থেমে আসছে রানা দেখল কপালের ঘাম মুছছে ক্যাথি। হাত কাঁপছে তার। সেই মুহূর্তে আরেকবার ঘৃণা করল রানা জুয়া খেলাটাকে। এ এক কুৎসিত সংক্রামক ব্যাধি।

'থারটি-ফোর। রেড। হাই অ্যাণ্ড ইভেন।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল আশেপাশে। লোভী দৃষ্টিতে সবাই চেয়ে দেখল গুণে গুণে আশিটা লাল 'প্লেক' ক্যাথির পাশে সাজিয়ে দিল ক্রুপিয়েই। মোট হলো একশো যাটটা।

'ব্যস। চলুন,' রানা ডাকল ক্যাথিকে।

'আর খেলবেন না?'

'না।'

ক্যাথিকে নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাউন্টারের দিকে এগোল রানা। ষোলোটা হাজার ডলারের নোট গুণে নিল ক্যাথি দুই তিনবার করে। তারপর সেগুলো কালো ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে আবার এসে বসল রানার সঙ্গে কোণের সেই টেবিলটায়। হাতের ব্যাগটা সযত্নে রাখল সে টেবিলের মাঝখানে।

নিজের জন্যে একটা কোক আর ক্যাথির জন্যে আরেকটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ অর্ডার দিয়ে রানা বলল, 'আপনার কপালটা সত্যিই ভাল।'

'আমার কপাল মানে? খেললেন তো আপনি—আমি তো কেবল আপনার কথা মত কাজ করলাম।'

'যাই হোক, আপনার কপালেই তো হলো। এখন আমার চার হাজার ডলার শোধ করে দিন।'

'সবই আছে ব্যাগে। বের করে দেব?' ব্যাগে হাত দিল ক্যাথি।

'না। সব কেন? আমার টাকা আমাকে দিয়ে দিন। আপনি খেলে যা জিতেছেন—ও টাকা আপনার। আমাকে দেবেন কেন?'

অবাক হয়ে রানার চোখের দিকে চাইল ক্যাথি ডেভন। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে—চোখ দুটো বিস্ফারিত। কথাগুলো যেন ঠিক বুঝতে পারল না সে। বারো হাজার ডলার!

এ কী সম্ভব? বলল, 'যাহ্, ঠাট্টা করছেন!'

'ঠাট্টা নয়, সত্যি। বারো হাজার ডলার দরকার বলছিলেন না? সেই বারো হাজার আজ নিজেই উপার্জন করে নিলেন আপনি।'

বিস্মিত, বিমূঢ় ক্যাথি ধীরে ধীরে বুঝল কেন ওকে আজ এখানে নিয়ে এসেছে মাসুদ রানা। কেন জোর করে ওকে ধার দিয়েছে চার হাজার ডলার। তারপর যেন এটাকে সে অপরিচিত বিদেশীর অযাচিত দান বলে প্রত্যাখ্যান করতে না পারে সেজন্যে তাকে দিয়ে খেলানো হয়েছে সবটা খেলা। কথাটা ঠাট্টা নয়। তাকে দশ বছরের দুর্বিষহ দায় থেকে মুক্ত করে দিয়েছে ওই নিষ্ঠুর, দুর্ধর্ষ চেহারার পাকিস্তানী স্পাই। হঠাৎ এক অদম্য আবেগে উথলে উঠল ক্যাথির বুকের ভিতরটা।

টেবিলের কিনারা ধরে না ফেললে হয়তো পড়ে যেত ক্যাথি। দুই কনুই টেবিলের ওপর রেখে দুই হাতে দুই গাল ধরে নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করল সে। তারপর হঠাৎ দুই চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে

গিয়ে। টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল প্লাস্টিক ঢাকা টেবিলের ওপর হাতের তালু বেয়ে। একজন ওয়েটার তাই দেখে এগিয়ে আসছিল, হাতের ইশারায় তাকে সরে যেতে বলল রানা। এক মিনিটের মধ্যেই সামলে নিল ক্যাথি। চোখ মুছে নিয়ে বলল, 'মাফ করবেন। নিজেকে সামলাতে না পেরে এক বিশ্রী সীন ক্রিয়েট করলাম। কিন্তু কেন আপনি এটা করলেন? কেন আমার মত একটা নিঃস্ব মেয়েকে হঠাৎ এমন প্রাচুর্যে ভরে দিলেন? অদ্ভুত লোক আপনি। আপনি বুঝতে পারবেন না, মি. মাসুদ রানা, আমার কেমন লাগছে। এত টাকা সব আমার। বাবার কেমন লাগবে? উহ্! আর উইলিয়াম! বলতে বলতে আবার দুই বিন্দু জল নেমে এল গাল বেয়ে।

মৃদু হেসে কোকের গ্লাসে চুমুক দিল রানা। চেয়ে চেয়ে দেখল সে একটা বিদেশী মেয়ের উদ্বেগ, বিস্ময়, উত্তেজনা এবং আনন্দাশ্রু। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, 'পৌনে আট। ওঠার সময় হলো। ওটুকু শেষ করে চলুন উঠে পড়ি।' বিল চুকিয়ে দিল রানা।

গ্লাসটা শেষ করে এক চিমটি লবণ তুলে মুখে ফেলল ক্যাথি ডেভন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন।'

হোটেলের সামনে রানাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ক্যাথি দুই ডানা মেলে ভবিষ্যৎ সুখ-কল্পনায় ভাসতে ভাসতে। জীবনের সবক'টা দিন যদি এমনি সুখের হত!

ঘরে ঢুকেই রানা বুঝল, ওর অনুপস্থিতিতে কেউ এসেছিল ঘরের ভিতর। জিনিসপত্র যেমন রেখেছিল ঠিক তেমনটি আর নেই। খোয়া যায়নি কিছুই—কিন্তু সমস্ত জিনিসপত্র ঘেঁটেছে কে যেন। চোর হলে তো চুরি করত। তাহলে? ব্যাপারটা আবছাই থেকে গেল রানার কাছে।

রাতে, বিছানায় শুয়ে, রানা ভাবল মিত্রার কথা। কেন যে ঘুরেফিরে বারবার এই মেয়েটির ছবি ভেসে ওঠে মনের পর্দায় বুঝতে পারে না রানা। কেন অবসর পেলেই নিজের অজান্তে ওর কথা ভাবতে থাকে সে? দেখা হবে আর কোন দিন? কেন যে এমন হয়—হঠাৎ কেন এমন ফাঁকা লাগে? রানার জীবনে কোথায় যেন একটা মস্ত গলদ রয়ে গেছে। বুঝতে পারে না সে অনেক ভেবেও, ত্রুটি ঠিক কোন-খানটায়।

দশ

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

'ইওর অ্যাটেনশন, প্লীজ! প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ অ্যানাউন্সেস দা ডিপার্চার অভ ইট্‌স্ জেট ক্লিপার রাউণ্ড দা ওয়ার্লড সার্ভিস ফ্লাইট পি.এ. জেরো জেরো ওয়ান, টু রেঙ্গুন-ক্যালকাটা-কারাচী-বায়রুত-ইস্তাম্বুল-মিউনিখ-ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-লণ্ডন-নিউ ইয়র্ক। প্যাসেঞ্জারস আর রিকোয়েস্টেড টু বোর্ড দা এয়ারক্রাফট। থ্যাঙ্ক ইয়ু।'

চড়া পর্দার তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ বিশটা লাউড-স্পীকার থেকে ছড়িয়ে পড়ল গোটা

এয়ারপোর্টে।

বহু ছাপ-ছোপ দেয়া পাসপোর্টটা ফেরত পেয়ে প্যাসেঞ্জারস লাউঞ্জের দিকে এগোল রানা। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন প্যাসেঞ্জার। রানা খেয়াল করল, একজন যাত্রী ওকে লক্ষ করছে সামনে ধরা খবরের কাগজের আড়াল থেকে, আড়চোখে। আনমনে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। লোকটার হাতে ধরা কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল সে। তেসরা তারিখের একটা পূর্ব-পাকিস্তানী কাগজ। রানার দুর্ঘটনার খবরটা পড়ছে লোকটা মনোযোগ দিয়ে। মাটিতে রাখা একটা অ্যাটাচি কেসের গায়ে লোকটার নাম পড়ল রানা—টি.আর. পট্টবর্ধন।

নিশ্চয়ই ভারতীয়। টের পেয়ে গেল নাকি ওরা? ফ্লাইট ক্যান্সেল করে দেবে? সপ্তাহে তিনটে মাত্র ফ্লাইট—মঙ্গল, বিষ্যুৎ, শনি। আজ না গেলে ছ'তারিখের আগে পৌঁছতে পারবে না টিটাগড়। কিন্তু টের পাবে কি করে? অসম্ভব। এটা বোধহয় দৈব-সংযোগ। গত রাতে তার ঘরে লোক ঢোকার কথাও মনে পড়ল রানার। গোড়াতেই গলদ হয়ে গেল না তো? এই অবস্থায় কোলকাতায় যাওয়া কি নিরাপদ? ঘুরে দাঁড়াল চিন্তিত রানা। তারপর স্থির করল, এখন আর পিছিয়ে যাওয়া যায় না।

প্লেনে উঠবার সিঁড়িতে পা দিয়েই নিজের নাম, অর্থাৎ মি. থিরা শুনে থমকে দাঁড়াল রানা। দেখল ক্যাথি ডেভন আসছে পেছন থেকে দৌড়ে।

'ওই পট্টবর্ধন থেকে সাবধান। ও কিছু একটা সন্দেহ করেছে। খুব সাবধান! এখন সব কথা বলবার সময় নেই।' কাছে এসে নিচু গলায় কথাটা বলেই লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাথি। একটা রক্ত গোলাপের কুঁড়ি রানার কোটে লাগিয়ে দিল সে। তারপর বলল, 'আজকের ফ্লাইটটা ক্যান্সেল করতে পারেন না?'

'না, দেরি হয়ে যাবে। নেক্সট ফ্লাইট সাত তারিখে। অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

রানা লক্ষ করল ভিতর ভিতর কেন জানি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ক্যাথি।

'আপনি গ্র্যাণ্ড হোটেলেই উঠছেন না?'

'খুব সম্ভব।'

'ওই হোটেলেই আছে আমার বোন স্যালি ডেভন। আমার একটা চিঠি দেবেন তাকে দয়া করে?'

'নিশ্চয়ই। আর মি. থ্রীসানানকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। গুড বাই।'

'গুড বাই। তায়া খণ্ডিওস।'

চিঠি নিয়েই রানা উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। রুমাল নাড়ল ক্যাথি। রানাও একটু হাত নেড়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। রানার ঠিক পেছনের সীটে এসে বসল টি.আর. পট্টবর্ধন। মাথায় একবোঝা দুশ্চিন্তা নিয়ে সীট বেল্ট বাঁধল মাসুদ রানা।

সুনীল সাগর পেরিয়ে এল রুপোলী নদী-নালার দেশ—শ্যামল বাংলা। নিচে সবুজ কার্পেট বিছানো। তারপর মহানগরী কলকাতা—ছোট ছোট ঘর বাড়ি, খেলনার মত ট্রাম-বাস, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গড়ের মাঠ, মনুমেন্ট, হাওড়া ব্রিজের একাংশ।

ক্লিপার জেট নামল দমদম এয়ারপোর্টে। রানওয়ের ওপর দিয়ে ট্যাক্সিইং করে এসে একপাক ঘুরে দাঁড়াল প্রকাণ্ড প্লেনটা হ্যাঙ্গার এবং এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের

মাঝামাঝি জায়গায়। এয়ার কণ্ডিশন করা প্লেন থেকে বেরিয়েই অসম্ভব গরম লাগল রানার। রোদের মধ্যে এইটুকু পথ হেঁটে যেতে ঘাম দেখা দিল কপালে। পিছন পিছন এল পট্টবর্ধন।

মস্ত লাউঞ্জে গিয়ে বসল সবাই। মাল নামবে, কাস্টমস চেকিং হবে—বেশ অনেকক্ষণের ব্যাপার। ফাইভ ফিফটি-ফাইভের টিন থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল পট্টবর্ধন। বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জারই একবার জেন্টস লেখা ঘর থেকে ঘুরে এল। রানা গেল না। এবং রানাকে চোখের আড়াল করবে না বলে পট্টবর্ধনও বসে রইল পায়ের ওপর পা তুলে। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল রানা।

বেশ খানিকক্ষণ পর ডাক এল প্যাসেঞ্জারদের কাস্টমস-চেকিং রূমে যাবার জন্যে। সবাই যে যার ছাতা, লাঠি আর ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়ল ছত্রভঙ্গ হয়ে। এবার রানা গিয়ে ঢুকল টয়লেটে। পরমুহূর্তেই এসে ঢুকল পট্টবর্ধন। বেচারা অনেকক্ষণ ধরে বোধহয় চেপে রেখেছিল। ভাবল এই সুযোগে দুটো কাজই সেরে নিই। নজর রাখাও হবে, আর··· । ঢুকেই দেখল রানা দাঁড়িয়ে গিয়েছে জায়গা মত। আর জায়গা নেই দাঁড়াবার। কিন্তু ল্যাট্রিনের দরজাটা খোলা। প্রস্রাব ও পায়খানার আলাদা বন্দোবস্ত। আর চাপতে না পেরে ঢুকে পড়ল সে ল্যাট্রিনের মধ্যে।

এক মুহূর্ত দেরি না করে বাইরে থেকে বল্টু লাগিয়ে দিল রানা ল্যাট্রিনের। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। দেখল লাউঞ্জ খালি। বাইরের দরজাটাও বল্টু লাগিয়ে দিয়ে ভাবল জমাদার ব্যাটা তাড়াতাড়ি এসে না পড়লেই এ-যাত্রা রক্ষা পাওয়া যায়। দুম দুম করে ল্যাট্রিনের দরজায় বাড়ি মারার শব্দ শুনল রানা কান পেতে। নাহ্, কেউ খেয়াল করবে না। 'কাস্টমস' লেখা দরজা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঢুকল রানা এবার।

'মি. চরোসা থিরা?' কাস্টমস্ অফিসার চাইল রানার দিকে।

'ইয়েস!'

রানার সুটকেসের ওপর লাগানো একটা লেবেল, ওর নামের নিচে 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর' এবং তার নিচে 'আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল' ইত্যাদি শব্দগুলো চোখে পড়ল অফিসারের। ব্যস, আর ঝামেলা হলো না। দুটো স্ট্যাম্প ছিঁড়ে সুটকেস এবং অ্যাটাচি কেসে লাগিয়ে দিল। সাদা চক দিয়ে ক্রস এঁকে দিল দুটো।

'উইশ ইয়ু হ্যাপি স্টে, স্যার।'

'থ্যাঙ্ক ইয়ু।'

একটা পোর্টার তুলে নিল রানার সুটকেস মোটা বখশীশের লোভে। বিদেশী লোক, বেশি দেবে নিশ্চয়ই।

'ট্যাক্সি, স্যার?'

মাথায় পাগড়ি আর হাতে বালা পরা লম্বা চওড়া শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে দাঁড়াল যমদূতের মত। পোর্টারকে ড্রাইভারের সঙ্গে এগোবার জন্যে ইশারা করে রানা বলল, 'কিপ্ দ্যাট অন দ্য ব্যাক সীট।'

পকেট থেকে দুটো একশো ডলারের নোট বের করে ভাঙিয়ে ইণ্ডিয়ান কারেন্সি নিল রানা এয়ারপোর্টের ব্যাঙ্ক থেকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই ভূত দেখার মত চমকে উঠল।

মিত্রা! ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বিশেষ ড্রেস পরে একটা কাউন্টারের ওপাশে

বসে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে মিত্রা সেন। মিত্রা কি ছেড়ে দিল সিক্রেট সার্ভিস? হঠাৎ এই বেশ কেন? ওর ওপর নজর রাখবার জন্যে এই ভোল নেয়নি তো!

নিজের অজান্তেই মুখটা অল্প একটু হাঁ হয়ে গেছে মিত্রার। খুব চেনা চেনা লাগছে ওর এই লোকটাকে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না কোথায় দেখেছে এর আগে। এই ফিগার, ঠিক এমনি ব্যাক ব্রাশ করা চুল, প্রশস্ত কপাল, ওই দৃষ্টি যেন তার অনেক চেনা। মাসুদ রানা! নিশ্চয়ই এ মাসুদ রানা!

এক মুহূর্তেই সামলে নিয়েছে রানা। না চেনার ভান করে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল সে, কাঁটা ঘুরিয়ে রিস্ট-ওয়াচটা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের সঙ্গে মিলিয়ে নিল। তারপর এগিয়ে গেল গাড়ি-বারান্দার দিকে। হাঁটার ভঙ্গিটা একটু বদলে নিল সে। পেছনে ফিরে চাইল না আর একটিবারও।

কিন্তু চাইলে দেখতে পেত এক অবর্ণনীয় খুশিতে ঝলমল করে উঠল মিত্রা সেনের মুখ। চিনতে পেরেছে সে। ওই দৃষ্টি ভুলবার নয়। তাহলে বেঁচে আছে! চোখ বন্ধ করে দুই হাত তুলে কপালে ঠেকাল সে তার অদৃষ্ট দেবতার উদ্দেশে। দুই ফোঁটা জল ঝরে পড়ল তেসরা তারিখের একটা পূর্ব-পাকিস্তানী খবরের কাগজের ওপর।

চিড়িয়ামোড়, গানফাউন্ড্রী রোড, কাশীপুর রোড, ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোড, শ্যামবাজার, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে এঁকে বেঁকে এসে শিখ ড্রাইভার থামল চৌরঙ্গীর গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে। পিছনের সীটে বসে এতক্ষণে গোলাপের কুঁড়িটা পকেটে পুরেছে রানা, উল্টে পরেছে কোট, প্লেনের সব রকমের ট্যাগ ছিঁড়ে ফেলেছে সুটকেস এবং অ্যাটাচি কেস থেকে, টান দিয়ে চরোসা থিরার লেবেল উঠিয়ে ফেলেছে বাক্সের ডালা থেকে। অন্য মানুষ হয়ে বেরিয়ে এল সে গাড়ি থেকে।

সুন্দরী রিসিপশনিস্টের প্রচুর প্লীজ এবং থ্যাঙ্কিউ-র পর লিফটে করে উঠে এল রানা তেতলার একটা চমৎকার ডাবল-বেড রূমে। খ্রিস্টান নাম নিয়েছে সে এবার। মরিস রেমণ্ড। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর সেলস ম্যানেজার। এয়ারকুলারটা অন করে পোর্টারকে বখশীশ দিয়ে বিদায় করে দরজা লাগিয়ে একটা চেয়ারে এসে বসল। অতি দ্রুত চিন্তা করছে সে।

পট্টবর্ধন এতক্ষণে ছাড়া পেয়েছে নিশ্চয়ই। ধরা পড়ে গেছে রানা। তার থাই পাসপোর্টের আর কানাকড়ি মূল্যও নেই এখন। সে এখন একটা পাকিস্তানী স্পাই ছাড়া কিছু নয়। এখানে যদি ধরা পড়ে তাহলে কোন সাহায্য পাবে না সে স্বদেশ থেকে। সোজা অস্বীকার করবে পাকিস্তান ওর পরিচয়। জামার একটা বোতামে হাত বুলাল মাসুদ রানা। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে পটাশিয়াম সায়ানাইড লুকোনো আছে বোতামটায়। সে তো অনেক পরের কথা। এখন কি করা যায়?

নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি হোটেলে খোঁজ নেয়া হবে চরোসা থিরা বলে কেউ উঠেছে কিনা। না পেলে সারা কলকাতার প্রত্যেকটি হোটেলে আজ যত লোক উঠেছে তাদের সবাইকে পরীক্ষা করে দেখবে ওরা। রানার চেহারার বর্ণনা দেয়া হবে প্রত্যেকটি হোটেলে, থানায় এবং ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এ। রানার ফটোগ্রাফ পাঠানো

হবে সব জায়গায়। শহরটা তছনছ করে খুঁজবে ওরা মাসুদ রানাকে। অবশ্য, সহজ হবে না, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া একটা মানুষকে খুঁজে বের করা কঠিন আছে। কথাটা ভেবে একটু আশ্বস্ত বোধ করল ও।

কিন্তু ধরা পড়ল কি করে? কোনখানে ভুল করল সে? থাই ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ এখন ওর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত দাগ মুছে ফেলল রানা কেমিক্যালস দিয়ে। চরোসা থিরার পাসপোর্ট, ভিজিটিং কার্ড, প্লেনের টিকেট, ইত্যাদি সব চিহ্ন এক সঙ্গে জমা করে বাথরুমে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলল সে। এখন আর কোন আবরণ থাকল না, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে টিকে থাকতে হবে। ধরা পড়লে হয় বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করবে, না হয় বোতাম তো আছেই। হঠাৎ মনে হলো, মিত্রা? এই অবস্থায় মিত্রা কোন সাহায্য করবে?

'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস? গুড আফটার নুন, ম্যাডাম। পুট মি টু এনকোয়্যারি কাউন্টার প্লীজ!'

'জাস্ট হোল্ড আ মোমেন্ট, স্যার। এনকোয়্যারী এনগেজড্।'

দশ সেকেণ্ড অধীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা রিসিভার কানে ধরে। তারপর খটাং করে ও-ধারের রিসিভার তুলল মিত্রা সেন। গড় গড় করে আউড়ে গেল গৎ।

'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস, এয়ারপোর্ট এনকোয়্যারী। গুড আফটার নুন।'

'চিনতে পারছ, মিত্রা?'

ধক করে উঠল মিত্রার বুকের ভিতরটা। সেই গলা! সত্যিই সে বেঁচে আছে? ভুল হয়নি তার।

'হ্যাঁ, পারছি।'

'কেমন আছ?'

'ভাল।'

'আমার ঠিকানাটা বলব?'

'না। এটা ওপেন লাইন।'

'কোথায় দেখা হবে?'

'পাঁচটায়। চিড়িয়াখানার সামনে।'

'কেবল তুমি থাকবে, না আশেপাশে তোমার বন্ধু-বান্ধবকেও আশা করব?'

'অবিশ্বাস কোরো না।'

'কারণ?'

'পরে বলব। অনেক কথা আছে, সব বলব। রাখলাম।' ছেড়ে দিল মিত্রা।

নীরব রিসিভারটা কান থেকে সরিয়ে একবার দেখল রানা, তারপর নামিয়ে রেখে সোজা ঘরে ফিরে গিয়ে লাঞ্চ অর্ডার দিল। 'মাটন'টা বাদ রাখল অর্ডার থেকে সযত্নে। 'মাটন' বলতে এরা বোঝে পাঁঠার মাংস—আর ওই গন্ধটা একদম বরদাস্ত করতে পারে না সে।

আবার চিন্তার ঘোড়দৌড় চলল রানার মাথার মধ্যে। কতক্ষণ? আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে ও? চব্বিশ ঘণ্টা? এর মধ্যেই হোটেল পরিবর্তন করতে হবে। প্ল্যান করে ফেলল সে কিভাবে এগোবে। কিভাবে ভুল নিশানা দিয়ে ওদের চোখে

ধুলো দেবে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো রানা।

স্নান সেরে খেয়ে নিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল সে দরজা বন্ধ করে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই পিস্তলটা পরীক্ষা করে নিল একবার। তারপর বালিশের পাশে পিস্তলটা রেখে ওটার বাঁটের ওপর ডান হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

রানা যখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে অনেকগুলো সরকারী ডিপার্টমেন্টে ইমার্জেন্সী অর্ডার এল। টেলিফোনের পর টেলিফোন চলতে থাকল সারা কলকাতা জুড়ে। মৌমাছির চাকে যেন ঢিল পড়েছে। অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠল এক শ্রেণীর কর্মচারী। ওয়্যারলেসে ইনফরমেশন গেল টিটাগড়। মাইক্রোবাস থেকে মোড়ে মোড়ে নামিয়ে দেয়া হলো এক-এক জোড়া সন্ধানী চোখ—হাতে বি-টু সাইজের একটা করে ফটো।

ঠিক সাড়ে চারটায় পাক্কা বিলেতী পরিচ্ছদ পরে বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। চেহারাটা সামান্য পরিবর্তন করে নিয়েছে সে। হাতে দামী সানগ্লাস।

লিফটের দিকে না গিয়ে করিডর ধরে এগোল রানা সিঁড়ি ঘরের দিকে। বাম পাশে মোড় ঘুরে দেখল একটা মেয়ে ঘরে তালা দিয়ে রওনা হলো সিঁড়ির দিকে। প্রথমেই রানার মনে হলো ক্যাথি এখানে কেন। পর মুহূর্তেই বুঝতে পারল এ ক্যাথি নয়, তার বোন স্যালি ডেভন। ক্যাথির চাইতে দেখতে অবশ্য এ-অনেক ভাল, তবে দু'বোনে মিল আছে চেহারায়। চিঠিটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। পকেট হাতড়ে পেয়ে গেল। ওটা বের করে নিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সে মেয়েটির দিকে।

'আপনি বোধহয় মিস স্যালি ডেভন! তাই না?'

রানার দিকে চেয়েই অসম্ভব চমকে উঠল মেয়েটি। বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি স্যালি। আর আপনি?'

'আমার নাম মরিস রেমণ্ড। সম্প্রতি ব্যাঙ্কক থেকে এসেছি। আপনার জন্যে চিঠি আছে।' স্যালির চোখের দৃষ্টিটা একটু অদ্ভুত লাগল রানার।

'কে দিয়েছে?'

'আপনার, বোন, ক্যাথি।'

চিঠিটা প্রায় থাবা দিয়ে কেড়ে নিল স্যালি রানার হাত থেকে। খাম ছিঁড়ে ওখানে দাঁড়িয়েই পড়তে আরম্ভ করল। থাই ভাষায় লেখা চিঠিটা। কিছুটা পড়ে রানার মুখের দিকে চাইল একবার। রানা চলে যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে। স্যালি ডাকল, 'শুনুন।'

'কিছু বলছেন?'

'একটু অপেক্ষা করুন দয়া করে।'

আধাআধি পড়েই চিঠিটা ভাঁজ করে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, আমার ঘরে চলুন।'

ঘরে এসে বসল ওরা দু'জন। চিঠি শেষ করে গভীর-চিন্তামগ্ন মুখে চুপচাপ বসে থাকল স্যালি ডেভন। কপালে ভ্রূকুটি। হঠাৎ আনমনে বলল, 'আমি একা এখন চেষ্টা করলে কি হবে? ভুল যা হবার হয়ে গেছে।'

'কোনও দুঃসংবাদ?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'না, দুঃসংবাদ আপনার। আপনার সামনে এখন ভয়ানক বিপদ মি. মাসুদ

রানা। হন্যে হয়ে খুঁজছে ওরা আপনাকে।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'এই চিঠি পড়ে। আমার বোন আপনার সর্বনাশ করেছে, মি. রানা। টাকার বিনিময়ে ব্যাঙ্ককের ইণ্ডিয়ান সিক্রেট এজেন্টের কাছে আপনার আসল পরিচয় বিক্রি করেছে। কিন্তু সেই সন্ধ্যাতেই আপনি আমাদের টাকার প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন চিরকালের মত। তার আগেই ও ভুল করে বসে আছে! আমাকে লিখছে আপনাকে সাহায্য করতে। কিন্তু আমি এখন একা কি করব…'

রানার মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। ক্যাথি! ক্যাথি বিশ্বাসঘাতকতা করল? এই জন্যে ব্যাঙ্কক থেকে লোক লেগে গেছে ওর পিছনে! কেউ যেন রানার বুকে আমূল বসিয়ে দিয়েছে একটা ছুরি। ছাড়া যাবে না ওই পিশাচিনীকে। আরও কত লোকের সর্বনাশ করবে কে জানে। স্যালির শেষের কথাগুলো রানার কানের ভিতর ঢুকল না। উঠে দাঁড়াল সে। চট করে রানার হাত ধরল স্যালি।

'আমার বোনকে ক্ষমা করতে হবে, মি. রানা। আপনার হাত ধরে ক্ষমা চাইছি আমি আমার বোনের হয়ে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ও…আর কারও ক্ষতি করতে পারবে না কখনও। আত্মগ্লানিতে মরছে এখন। টাকার আমাদের কত প্রয়োজন ছিল আপনি বুঝতে পারবেন না, মি. রানা। কত যে কষ্ট করেছি আমরা…' গলাটা ভেঙে এল। পানি বেরিয়ে এল দুই ফোঁটা। বিকৃত হয়ে গেল মুখটা কান্নায়।

টাকার প্রয়োজন, মনুষ্যত্ব, ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধ, আর মানুষের খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার অধিকার, সব মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে গেল রানার মনের মধ্যে। শান্তভাবে হাতটা ছাড়িয়ে নিল স্যালির হাত থেকে। ভাবল কাউকে বিচার করবার অধিকার তার নেই। মানুষের হাজারো সমস্যার কতটুকু সে জানে, বিচার করবে বিচারক। সে কেবল দেখে যাবে। চোখের জলে নিভে গেল ক্রোধের আগুন।

'আপনি আমাকে দেখেই চমকে উঠেছিলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনার ছবি দেখেছিলাম আমি আমার এক বন্ধুর কাছে। সারা কলকাতায় হাজারটা চোখ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হোটেলে আজ রাতটা আপনি নিরাপদ। ভোর ছ'টা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত যে মেয়েটি কাউন্টারে থাকে সে ছাড়া আর কেউ আপনার খবর দিতে পারবে না ওদের। তার মধ্যেই আমি ভেবে দেখি কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

'ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না।'

বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। স্যালিও বেরোল পিছু পিছু। আঙুল দিয়ে স্যালিকে লিফটের দিকে যাবার নির্দেশ দিয়ে সিঁড়ি ঘরের দিকে চলে গেল রানা।

দেরি হয়ে গিয়েছে। সানগ্লাসটা পরে নিয়ে হাতের ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডাকল রানা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে।

'আলীপুর। চিড়িয়াখানা।'

পিছনের সীটে বসে রানা ভাবছে, এইবার বোঝা গেল কি করে ওরা টের পেল তার সত্যিকার পরিচয়! এতক্ষণ কিছুতেই জটিল গ্রন্থিটা খুলতে পারছিল না সে। চারদিক থেকে আঁটঘাট বেঁধে নেমেছিল ও। হঠাৎ সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। খেলা মাত্র শুরু হয়েছে পন কে ফোর, পন কে ফোর, কিংস নাইট বিশপ থ্রী, কুইন্স্

নাইট বিশপ থ্রী, বিশপ নাইট ফাইভ, পন কুইন্স থ্রী—ব্যস আড়াই বছরের বাচ্চা মেয়েটা এসে উল্টে দিল যেন দাবার বোর্ড।

ঠিক সোয়া পাঁচটায় পৌঁছল রানা চিড়িয়াখানার গেটের সামনে। মিত্রা এসে দাঁড়াল। দুটো টিকেট কেটে রেখেছে সে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল রানা।

'দেরি হয়ে গেল একটু,' রানা লজ্জিত হলো।

'দেরি কোথায়? পাকিস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে পনেরো মিনিট আগেই পৌঁচেছ বরং। আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতাম, লোকে যে যাই ভাবুক না কেন।'

অনেক হাঁটল দু'জন। হরেক রকম রঙ-বেরঙের পাখি, বানর, বাঘ-ভালুক-সিংহ, জিরাফ, জেব্রা, হিপোপটেমাস, গণ্ডার সব দেখে বসল গিয়ে ওরা নির্জন লেকের পারে পাথরের আসনে। লেকের ভিতর দ্বীপের মত জায়গাটায় লাল আর কালো ঠোঁটের রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে অল্প জলে, আর থেকে থেকে শামুক তুলছে ডুবে ডুবে। এতক্ষণ দরকারী একটা কথাও হয়নি ওদের মধ্যে।

রানার বাঁ হাতটা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখল মিত্রা।

'অনেক কথা বলবে বলেছিলে, কই একটা কথাও তো বলছ না?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'কথাগুলো গুছিয়ে নিতে পারছি না।'

'তুমি এয়ার লাইন্সে ঢুকলে কবে? আর ঢুকলেই যদি, এয়ার হোস্টেস্ হলে না কেন?'

'এয়ার হোস্টেস্? গ্ল্যামারের লোভে সব খোয়ানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মামাকে ধরে জয়দ্রথের মুঠি থেকে বেরিয়েছি। নাচের স্কুলে মাস্টারি করতে পারতাম—আগেও ভরতনাট্যম আর কথক শিখিয়েছি আমি—কিন্তু ভাবলাম কিছুদিন এয়ার লাইনসের রিসেপশনে অপেক্ষা করব তোমার জন্য।'

'কেন? কিসের অপেক্ষা?'

'আমি জানতাম, তুমি আসবে, তোমার সাহায্য দরকার হবে।'

'তুমি সাহায্য করবে আমাকে? কেন?'

'এইজন্যে যে আমি তোমার উপকারের প্রতিদান দিতে চাই।'

'কাজটা দেশের বিরুদ্ধে হলেও?'

'হ্যাঁ। অনেক ভেবেছি আমি, রানা। আসলে দেশ বলে কিছু নেই, গোটা পৃথিবীটাই আমাদের দেশ।'

'বলো কি?' বিস্মিত রানা মিত্রার মুখের দিকে চাইল।

'হ্যাঁ। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ রানা। মনুষ্যত্বই বড় কথা। আমাকে রক্ষা করে তুমি সত্যিকার একজন মানুষের পরিচয় দিয়েছ।'

'সত্যি বলছ, মিত্রা?'

মৃদু হাসল মিত্রা। 'আমি এখন জানি, কোনরকম শুভেচ্ছা নিয়ে যাইনি আমরা পূর্ব-বাংলায়, গিয়েছিলাম ভয়ানক কোন ক্ষতি করতে।'

'কি ক্ষতি?'

'তা জানি না। তবে নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু।'

সন্ধে হয়ে এসেছে। নিজের বিপজ্জনক অবস্থার কথা মিত্রাকে বলল রানা সব খুলে। বলল, আগামীকাল ভোরের ট্রেনে টিটাগড় যাচ্ছে সে। সব শুনল মিত্রা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যদি পারতাম, আটকে রাখতাম তোমাকে। কিছুতেই যেতে দিতাম না টিটাগড়ে। ওই দেয়ালের ওপাশে আমি যাইনি কখনও, তবে শুনেছি, যে যায় সে আর ফেরে না কোনদিন।'

'কী আছে ওখানে?'

'জানি না। জয়দ্রথ মৈত্রের সব চাইতে বিশ্বস্ত এক-আধজন ছাড়া বাইরের আর কেউ জানে না। যারা জানে তাদের বাইরে আসতে দেয়া হয় না। আমি জানতাম, পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব জোরদার করবার জন্যে আমাদের ওই সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা মিশন। কিন্তু কই, তাহলে কোনও মতে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম কেন আমরা? কি ছিল মৈত্র মশায়ের মনে, কতদূর সফল হলো সেই মিশন, তা তিনিই জানেন। আমি শুধু বলতে শুনেছি ওঁকে একবার—ওদিকের কাজ শেষ, এবার টিটাগড়ের প্রহরা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। অনেকগুলো অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানও ফিট করেছে ওরা এরিয়ার চারধারে।'

'তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে ক'টার মধ্যে?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইল রানা।

'আজ ফিরব না বলে দিয়েছি মামাকে। বলেছি বান্ধবীর বাসায় যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে যদি ধরা পড়ো তবে তো কঠিন শাস্তি হয়ে যাবে তোমার।'

'হবে না। ধরা পড়লে তো। ধরাই পড়ব না।'

'আমার মনে হয়, এখুনি আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া দরকার। নইলে পরে তোমার অনুতাপ হবে, নিজ দেশের…'

'শোনো, রানা। ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি আমি এখন। আমি তো আসলে আমার দেশের কোন ক্ষতি করছি না—প্রতিবেশী একটা দেশকে এক হীন চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করছি। তোমরা তো আমার দেশকে আক্রমণ করতে যাচ্ছ না। আমার দেশের কয়েকটা খারাপ লোক মিলে যদি শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীকে অন্যায় ভাবে পর্যুদস্ত করতে চায়, তাহলে পৃথিবীর নাগরিক হিসেবে সেটা বন্ধ করা আমার কর্তব্য নয়? অন্যায় যা, তা অন্যায়ই। নিজের দেশ অন্যায় করলে সেটা ন্যায় হয়ে যায় না।'

ঢং-ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। আটটা বাজে। আজকের মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চিড়িয়াখানা। বেরিয়ে এল ওরা।

ঠিক সোয়া আটটায় চিড়িয়াখানার গেটের পাশে একটা পাবলিক টেলিফোনে একটা বিশেষ নাম্বার ঘোরাল রানা। খটাং করে তুলল কেউ রিসিভার, কিন্তু কথা বলল না। হিশ্‌শ্ করে একটা একটানা শব্দ এল রানার কানে। আশেপাশে কেউ নেই, তবু গলাটা যতদূর সম্ভব খাদে নামিয়ে রানা বলল, 'মাসুদ রানা ইন ডেঞ্জার। সীক্‌স্ প্রোটেকশন অ্যাণ্ড হেল্‌প।' তাও কোন উত্তর নেই। আবার বলল রানা, 'আই রিপিট। মাসুদ্ রানা ইন ডেঞ্জার। সীক্‌স্ প্রোটেকশন অ্যাণ্ড হেল্‌প্।'

রেকর্ড হয়ে গেল রানার বক্তব্য। নামিয়ে রাখল রানা রিসিভার।

মিত্রাকে নিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে এল রানা। দু'জনের কেউ লক্ষ করল না,

ওরা লিফটে উঠতেই একজন লোক দ্রুতপায়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল।

ঘরে বসেই ওরা খেয়ে নিল সাত কোর্সের ইংলিশ ডিনার। স্যালির সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। কিন্তু সে তো এখন নাচ-ঘরে চলে গেছে। ওইখানেই দেখা করতে হবে ওর সঙ্গে। মিত্রা সেন ওসব নাচ দেখবে না বলে দিল পরিষ্কার। ওকে ঘরেই বসিয়ে ডান্সিং ফ্লোরের দিকে এগোল রানা। নাচের প্রথম সেশন আরম্ভ হচ্ছে তখন। টিকেট করে ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল রানা। বয় এসে দাঁড়াল পাশে। কোল্ড ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়ে চারধারে একবার চোখ বুলাল সে।

বারোশো বর্গফুট মত হবে চারকোনা ঘরটা। গোটা তিরিশেক টেবিল এলোমেলো ভাবে সাজানো। অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসেছে জোড়ায় জোড়ায়। ছেলে-বুড়ো সব রকম মুখই দেখা যাচ্ছে। বিকৃত রুচির সমাবেশ। সবার সামনেই গ্লাস। গরম হয়ে নিচ্ছে সবাই নাচ আরম্ভ হবার আগে। একটা মুখও চিনতে পারল না দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। ভাবল মহানগরী কলকাতায় একজন লোককে খুঁজে বের করা কি এতই সোজা। স্যালির সাথে আরেকবার দেখা না করে টিটাগড়ের পথে রওনা হতে পারছে না রানা। নাচের বিরতিতে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

একজন উঠে দাঁড়াল ডান্সিং ফ্লোরের ওপর। একটা স্পট্ লাইট পড়ল তার মুখের ওপর—বাকি ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল।

'আজকের অনুষ্ঠানই কলকাতায় মিস স্যালির শেষ অনুষ্ঠান। আপনারা যাঁরা আজ শেষ বারের মত তাঁর নাচ দেখতে পাচ্ছেন তাঁদের ভাগ্যবানই বলব। আজ আবহ-সঙ্গীতে আছেন জোসেফ ফার্নাণ্ডিজ।'

আরেকটা স্পট্ লাইট পড়ল ভায়োলিন, চেলো, ট্রাম্পেট, মারাক্কাস ও ড্রাম বাদকের ছোট্ট একটি দলের ওপর। স্টেজের ডান পাশে গোল হয়ে বসেছে তারা বিচিত্র রঙচঙে কাপড় পরে। বৃদ্ধ গোয়ানিজ মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল। 'ডুম' করে ড্রামের ওপর টোকা পড়ল একটা। মোলায়েম বাজনা এল কানে।

'এবার শুরু হচ্ছে নাচ। মিস স্যালি ডেভন ফ্রম ব্যাঙ্কক।'

ঘোষকের মুখের ওপর যে স্পট্ লাইটটা ছিল সেটা নিভে গেল। স্টেজের মাঝখানে এবার স্পট্‌লাইট পড়ল। কিছুই নেই সেখানে। আলোটা ধীরে ধীরে বেগুনী হয়ে গেল। যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল স্যালি ডেভন স্টেজের ওপর। ট্র্যাপ ডোরটা বন্ধ হয়ে গেল।

শুরু হলো নাচ।

মিত্রা সেনের ক্লাসিক্যাল নৃত্য নয়, তবে এ-নাচেরও পৃথক আবেদন আছে। ড্রাম, মারাক্কাস, ক্ল্যারিওনেট, ট্রাম্পেট, গিটার, বেহালায় পাশ্চাত্য সুর ও ছন্দ; আর স্যালির নৃত্যভঙ্গিমায় ফার-ইস্টের দোলা। কয়েক মিনিটেই মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল সে দর্শকদের।

রানাও উপভোগ করছে, এবং অপেক্ষা করছে, নাচটা শেষ হলেই···

হঠাৎ একটা বজ্রকঠিন হাতের থাবা এসে পড়ল রানার কাঁধের ওপর। চমকে

উঠল রানা। এক মুহূর্ত ফিরে এসেছে বাস্তব জগতে।

কানের কাছে মৃদু স্বরে কেউ বলল, 'দিস ইজ নো এনিমি, ব্রাদার—দিস ইজ এ ফ্রেণ্ড। ডেঞ্জার অ্যাহেড···'

এগারো

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

'···লেটস্ গেট আউট।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল রানা এক ঝটকায়। দেখল, কথাটা বলেই পেছন ফিরে দরজার দিকে এগোল ছায়ামূর্তিটা। রানাও বেরিয়ে এল লোকটার পিছু পিছু। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আলোকোজ্জ্বল লাউঞ্জের দিকে না গিয়ে বারের পাশ দিয়ে অন্ধকার করিডর ধরে এগোল লোকটা। একবারও চাইল না রানার দিকে ফিরে।

'কে আপনি?' এগিয়ে গিয়ে এক থাবা বসাল রানা লোকটার কাঁধে।

'কোন কথা নয়, জলদি বেরিয়ে আসুন আগে।'

অল্প কিছুদূর গিয়েই ছোট একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল ওরা হোটেলের বামধারের সুইপার প্যাসেজে। রানা ভাবছে আর এগোনো ঠিক হবে কিনা। খশ্ করে ম্যাচের কাঠি জ্বালাল লোকটা। সেই আলোর সামনে একটা কাগজ ধরল। রানা পড়ল:

Lew Fu-chung
01633
Chinese Secret Service

লাফিয়ে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। এরাও তাহলে চোখ-কান খোলা রেখেছে! ফু-চুং-এর নাম সে শুনেছে বহুবার। কলকাতার চীফ এজেন্ট। কিন্তু তাকে বের করে আনল কেন?

কাগজটা পুড়িয়ে ফেলল ফু-চুং। জুতো দিয়ে মাড়িয়ে ছাইটা গুঁড়িয়ে দিয়ে ইশারায় এগোতে বলল রানাকে। কিচেনের পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে পার হয়ে এল ওরা। বিরিয়ানী, কালিয়া কাবাব, চিকেন কারী, প্রন-কাটলেট, ফ্রায়েড এগ, কাঁচা পেঁয়াজ ইত্যাদি সব কিছুর গন্ধ মিলেমিশে একটা বোঁটকা গন্ধ এল নাকে। আরও কিছুদূর এগিয়ে মুখ খুলল লিউ ফু-চুং।

'আপনার ঘর এখন সার্চ হচ্ছে।'

'মিত্রা!' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'উনি এখন নিরাপদে আমাদের গাড়িতে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি আর এগোচ্ছি না—এখান থেকেই আবার ব্যাক ডোর দিয়ে হোটেলে ফিরে যাব। ওদের কার্যকলাপ লক্ষ করা দরকার। আপনি গলি-দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে হাঁটতে থাকবেন। ঠিক পাঁচশো গজ দূরে দেখবেন রাস্তার ওপাশে একটা কালো সুপার ডক্সল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আপনি উঠে বসলেই আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে ড্রাইভার। আমি বাসায় টেলিফোন করে সব ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছি। কোন

অসুবিধে হবে না আপনাদের। গুড্ লাক্।'

'সময় মত সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

উত্তর এল না কোন। ততক্ষণে পিছন ফিরে কয়েক পা এগিয়ে গেছে ফু-চুং। দ্রুত মিলিয়ে গেল সে অন্ধকারে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল সুপার ভক্স্ল্। হোটেলের দিকে এক নজর চেয়েই চমকে উঠল রানা। ঠিক লাউঞ্জে ঢুকবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জয়দ্রথ মৈত্র। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল সে এ-যাত্রা। আরও অনেক সাবধান হওয়া উচিত ছিল তার। মনে মনে নিজেকে কষে গোটা কয়েক চাবুক লাগাল রানা। শত্রুব্যূহের মধ্যে বুদ্ধির ঘোড়া আরও দ্রুত ছোটাতে হবে। বার বার আর ভাগ্য তাকে সহায়তা করবে না।

ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখল রানা আগাগোড়া সবটা ব্যাপার। খ্যাপা কুকুর হয়ে খুঁজছে তাকে এই দেশের এক মহা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কি করবে সে এখন? ফিরে যাবে পাকিস্তানে? সব কথা শুনে রাহাত খান নিশ্চয়ই ওকে দোষারোপ করতে পারবেন না। কিন্তু খুশিও হবেন-না। পরাজয়কে রাহাত খান ঘৃণা করেন। যে কাজে এসেছিল সেকাজ শেষ না করে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবে সে ওই অসমসাহসী তীক্ষ্ণধী বৃদ্ধের সামনে? আর একটু মাথা খাটালে নিশ্চয়ই কোন পথ বেরোবে কার্যোদ্ধারের। যাই ঘটুক না কেন, পালিয়ে যেতে পারবে না সে—অসম্ভব। কিন্তু এগোবে কোন্ পথে? প্রতি পদেই ধরা পড়বার ভয়। প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে ঢুকবে কি করে পাঁচিলের ভিতর? কোন বুদ্ধিই যে খেলছে না মাথায়। হেই, হ্যাট করে লেজে মোচড় দিয়েও নড়াতে পারছে না সে তার চিন্তার গরুর গাড়ি। ভাবনাটা দূর করে দিল রানা। মাঝে মাঝে এমন হয়—অনেক মাথা খাটিয়েও সমাধান পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনিই একটা পথ বেরিয়ে যায় ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে।

মৃদু হেসে বাইরে চেয়ে রইল সে। দ্রুত অপসৃয়মাণ বাড়ি-ঘর দোকান-পাট আর লাল-নীল নিয়ন সাইনবোর্ড দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল ওরা পার্ক স্ট্রীট ধরে। আমীর আলী এভিনিউ ছাড়িয়ে গড়িয়াহাটায় পড়ল সুপার ভক্স্ল।

'অত ভেব না। আমি তোমাকে সাহায্য করব, রানা।'

চমকে উঠল গভীর চিন্তামগ্ন রানা। মিত্রার উপস্থিতি সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। নিজের অজান্তেই ডুবে গিয়েছিল চিন্তায়।

'না,' মিত্রার কাঁধে হাত রাখল রানা। 'তোমাকে আর এসবে জড়াতে চাই না।'

'তোমাকে বলেছি তো, আর কোন দ্বন্দ্ব নেই আমার। তোমার এই বিপদের সময় আমি কিছুতেই চুপচাপ বসে থাকতে পারব না। আমি বুদ্ধি বের করে ফেলেছি।'

'কি বুদ্ধি, মিত্রা?'

'কাল সকালে তোমার যাওয়া হবে না টিটাগড়। আমি নিয়ে যাব তোমাকে সন্ধ্যায়। কোন কথাই যখন শুনবে না, ঢুকবেই যখন তুমি ওই প্রাচীরের ভেতর, তখন যাতে ঢোকার আগেই ধরা না পড়ো তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'তোমার সঙ্গে আমি গেলে তো!'

'কেন? যাবে না কেন?'

'আমার জন্যে কারও কোন বিপদ হোক, এটা আমি চাই না।'

'কিচ্ছু ঝুঁকি নেই। আমার মামার গাড়িতে যাব। গাড়ির সামনে ফ্ল্যাগ দেখলে কেউ ঠেকাতে সাহস পাবে না।'

'তুমি চাইলেই ওঁর গাড়ি পাবে? ওঁর নিজের কোন দরকার থাকতে পারে না?'

'উনি সন্ধের পরই জপে বসেন। অরবিন্দ ঘোষের চেলা। আজীবন ব্রহ্মচারী। স্বদেশী আন্দোলনের একজন পাণ্ডা ছিলেন। আমি ওঁর আদরের একমাত্র বোনঝি। ওসব তুমি ভেব না, গাড়ি পাব।'

মিনিট দশেক পর গাড়িটা থামাল মিত্রা। বলল, 'আমি এখানেই নামি। এই টেলিফোন নাম্বারটা রাখো, যখন ফোন করবে তখনই পাবে আমাকে। তুমি যেখানে বলবে সেখানেই গাড়ি নিয়ে হাজির থাকব।' একটু থেমে বলল, 'আর একটি কথা, দয়া করে অবিশ্বাস কোরো না আমাকে, প্লীজ।'

বালিগঞ্জে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল গাড়ি। রানার ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা। একজন চীনা মহিলা দরজা খুলে দিয়ে হেসে অভ্যর্থনা জানাল ওকে। সোনা বাঁধানো একটা দাঁত। মাথা ঝুঁকিয়ে হাতের ইশারায় রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল ভিতরে। মোজাইক করা সুন্দর ঝকঝকে তকতকে একটা বেডরুমে ওকে বসিয়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। একটু পরেই রানার সুটকেস এবং অ্যাটাচি কেসটা এনে রাখল ড্রাইভার এক কোণে।

রানা ভাবছে, পি.সি.আই.-এর পাত্তা নেই কেন? কি হলো? আর চাইনীজ সিক্রেট সার্ভিসই বা এত খবর জানল কোত্থেকে? এখানে একই সঙ্গে কাজ করছে নাকি দুই দেশ?

মিনিট পনেরো পর ফু-চুং এসে ঢুকল ঘরে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বলিষ্ঠ দেহ। চেহারা অনেকটা বাঙালীর মত। পরিষ্কার বাংলা বলে।

'ভাগ্যিস সময়মত মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, মি. রানা। আর একটু দেরি হলেই কাজ হয়েছিল আর কি! কিন্তু আপনাকে স্পট করল কি করে ওরা? তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে দেখলাম? আর আপনিই বা টের পেলেন কি করে যে ধরা পড়ে যাচ্ছেন?'

সমস্ত ঘটনা ভেঙে বলল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা খবর পেলেন কি করে?'

'ওহ্-হো! আপনি বুঝি জানেন না? গতরাতে আপনাদের পি.সি.আই.-এজেন্ট মোহাম্মদ আলী ধরা পড়ে গেছে দলবল সহ। এখন সে আই.এস.এস.-এর টরচার চেম্বারে। আমরা অপনাদের চীফের সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছিলাম আজ। তাঁর কাছেই আপনার আগমন সম্পর্কে জানতে পারি—টেলিফোন নাম্বারটাও। ন'টার দিকে আপনার মেসেজ পেয়েই আমি ছুটেছিলাম গ্র্যাণ্ড হোটেলে। পি.সি. আই.-এর কাজ এখন আমরা টেক-আপ করেছি। যতদিন অন্য লোক না আসবে ততদিন আমাকেই চালাতে হবে।'

'হোটেলের অবস্থা কি রকম দেখলেন?'

'কি আবার? আপনাকে না পেয়ে একটু অবাক হয়ে গেছে ওরা, কিন্তু মোটামুটি

নিশ্চিন্ত আছে, ধরা আপনাকে যাবেই। 'H' সেই ডাক্তারের সঙ্গে ঢুকল ওর কামরায়—আমি ফিরে এলাম।'

রানা বুঝল এই বন্ধুটির কাছেই স্যালি ডেভন ওর ছবি দেখেছে। তাই এক নজরেই চিনতে পেরেছিল আজ বিকেলে। জয়দ্রথের সঙ্গে স্যালি! হাসি পেল রানার।

'যাক, এখন আপনার প্ল্যান কি?' জিজ্ঞেস করল ফু-চুং।

'কাল যাচ্ছি টিটাগড়।'

'এত ঘটনার পরেও? নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাবেন। কোন লাভ নেই গিয়ে। আমি নিজে একবার দেখে এসেছি চারপাশ। অ্যাবসলিউট্‌লি ইন্‌ভাল্‌নারেবল্‌!' না সূচক মাথা নাড়ল ফু-চুং ঠোঁট উল্টে। 'অবশ্য আপনার কাজ, আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন। কিন্তু আমার মনে হয়…' —কথাটা আর শেষ করল না সে। হঠাৎ লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। 'আপনার বিশ্রাম দরকার। আর বিরক্ত করব না। কাল দেখা হবে। এখান থেকে ইচ্ছে করলেই আপনি আপনার চীফের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আমাকে বললেই ব্যবস্থা করে দেব। আচ্ছা, আসি। শুভরাত্রি।'

বারো

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

হিন্দুস্তান অ্যামব্যাসাডার-মার্ক টু। সিক্সটি ওয়ান মডেল। ফোর ডোর। থারটিন হানড্রেড নাইনটি নাইন সি. সি. বা ফোরটিন হর্স পাওয়ার। স্টিয়ারিং গিয়ার। ওয়ান পিস ফ্রন্ট সীট। ওয়াটার কুল্‌ড্‌ এঞ্জিন।

ভারতের তৈরি এই বেঢপ সাইজের কালো গাড়িটার চারধারে এক চক্কর ঘুরে দেখল রানা। মন্ত্রীত্ব লাভ করে মিত্রার মামাবাবু বোধহয় গাড়িটা পেয়েছেন সরকার থেকে। ছোট ভারতীয় পতাকা উড়ছে সামনে বনেটের ওপর। রানা বুঝল ডায়ালের ওপর '৯০' লেখা থাকলেও '৭৫'-এর এক ইঞ্চি বেশি যাবে না ঘন্টায়। গ্যালনে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল যেতে পারে বড় জোর, যদি টিউনিং ঠিক থাকে। কার্টসি লাইটের বাল্‌বগুলো খুলে ড্যাশ বোর্ডে রেখে দিল রানা।

তৈরিই আছে রানা। ছোট্ট একটা ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। দুটো ডেক্সেড্রিন ট্যাবলেট গিলে নিয়েছে আগেই। উঠে বসল সে গাড়ির পিছনের সীটে। ড্রাইভিং সীটে মিত্রা সেন। সাড়ে সাতটা বাজছে রানার রিস্টওয়াচে। উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠেছে দোকানে দোকানে।

গড়িয়াহাটা—লোয়ার সার্কুলার রোড—শেয়ালদা—আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড—শ্যামবাজার—বেলগাছিয়া—পাইকপাড়া হয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পড়ল ওরা। এরপর কামারহাটি—পানিহাটি—সোদপুর—খড়দহ হয়ে টিটাগড়। একটি কথাও হলো না ওদের মধ্যে সারাটা রাস্তায়।

টিটাগড় ছাড়িয়ে আরও আধমাইল গিয়ে স্পীড কমাল মিত্রা। বাঁয়ে মস্ত এরিয়া জুড়ে উঁচু পাঁচিল দেখা গেল আবছা মত। নাগরদোলায় চড়ে নামবার সময়ে, বা প্লেন

এয়ার-পকেটে পড়লে যেমন লাগে তেমনি হঠাৎ শূন্যতা অনুভব করল রানা পাকস্থলীর মধ্যে। এই সেই নিষিদ্ধ এলাকা। বাঁয়ে মোড় নিল গাড়িটা।

প্রাচীরের বাইরে দু'শো গজ জায়গা ছেড়ে কাঁটাতার দিয়ে সমস্ত এলাকাটা ঘেরা। হাই ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি দিয়ে সেই বেড়াকে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে। এছাড়াও কাঁটাতারের বাইরে প্রতি বিশ গজ অন্তর-অন্তর রাইফেল হাতে প্রহরী। ভেতরে ঢোকার একটাই মাত্র পথ। একটা সাদা-কালো রঙ করা পোস্ট দিয়ে পথটা বন্ধ। দুই পাশে সেন্ট্রির ঘর। দুইজন গেটের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেনগান হাতে। একটা বড় সাইনবোর্ডে লেখা:

PROHIBITED AREA
No Entry Without Pass

সাঁ করে এসে গেটের সামনে থামল গাড়ি। ফ্ল্যাগ এবং নাম্বার প্লেট দেখে স্যালিউট ঠুকল দুই প্রহরী। ক্রেন গেটের মত উঠে গেল পোস্টের এক মাথা ওপর দিকে। ঢুকে পড়ল গাড়ি সীমানার মধ্যে। শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গিয়েছিল রানার, আবার হেলান দিয়ে বসল।

খোয়া বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল হিন্দুস্তান অ্যামব্যাসাডার। প্রায় দু'শো গজ অন্ধকার পথ। তারপর উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আসল এলাকা। মস্ত স্টীলের গেট ভিতর থেকে বন্ধ। কলিং বেল টিপলে বেরিয়ে আসবে প্রহরী। দুই ধারের প্রহরী-কক্ষের ফুটো থেকে চারটে মেশিনগান তৈরি থাকবে ওদের জন্যে। ওই গেটে মন্ত্রী হোক আর যে-ই হোক, ছাড়পত্র দেখাতে হবে। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে হবে এবং উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে আগে থেকে কোন সংবাদ না দিয়ে এই হঠাৎ আগমনের। টেলিফোনে জয়দ্রথের অনুমতি আসবে। তারপর খুলবে খুলতে পারে সুরক্ষিত প্রকাণ্ড গেট।

'হেড লাইট নিভিয়ে দাও, মিত্রা।' গজ পঞ্চাশেক থাকতে বলল রানা। এবার ডান দিকে মাঠের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলো।

লাইট নিভিয়ে দিতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। পেছন ফিরে দেখল রানা কেউ লক্ষ্য করছে কিনা। না। সেন্ট্রি দু'জন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে পিছন ফিরে। ডান দিকে মাঠের মধ্যে নেমে গেল গাড়ি। ঠিকমত গ্রিজ দেয়া নেই, তাই ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট সাসপেনশন্ থেকে স্বাধীন ভাবে নানান স্কেলে ক্যাঁচকুঁচ শব্দ উঠল অসমান জায়গায় চাকা পড়ায়।

একটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাশে দেয়াল ঘেঁষে থামল মিত্রা।

ব্যাগটা আগেই ঝুলিয়ে নিয়েছিল কাঁধে, এবার এক লাফে নেমে এলো রানা গাড়ি থেকে। মিত্রাও নামল। বিশফুট উঁচু দেয়াল। হুক লাগানো দড়িটা ছুঁড়ে দিল রানা দেয়ালের মাথায়। খটাং শব্দ করে আটকে গেল সেটা।

'কাল ঠিক আটটার সময় আবার আসব আমি এখানে। দড়ি ফেলব ওধারে। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করব। যদি বেঁচে থাকো তবে এই জায়গাটায় ফিরে এসো কাজ শেষ হয়ে গেলে।'

'সেটা ঠিক হবে না, মিত্রা। আমি বেরোবার অন্য কোন পথ বের করে নেব। তুমি আর এসো না। তোমার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে...'

'আমি আসব। তুমি বারণ কোরো না; রানা, বন্ধুত্বের অমর্যাদা কোরো না।'

'বেশ, এসো। আর এখন ফেরার পথে ওই গেটটায় কলিং বেল টিপে তোমার মামা এখানে এসেছিলেন কিনা জিজ্ঞেস করে যেয়ো। তাহলে হঠাৎ আজ এখানে আসার ব্যাপারে সন্দেহ করবে না কেউ। কাল আবার আসার পথ পরিষ্কার থাকবে।'

বিদায় নিয়ে তরতর করে রশি বেয়ে উঠে গেল মাসুদ রানা। দেয়ালের ওপর উঠে মুক্ত বাতাস লাগল ওর চোখে-মুখে। একটা আলো এগিয়ে আসছিল ডান ধার থেকে। সর্চ লাইট। দেয়ালের ওপর দেহটা সাঁটিয়ে পড়ে থাকল রানা। পার হয়ে চলে গেল তীব্র আলোটা। সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল রানা ভিতরের দিকে। এখানে-ওখানে বাতি দেখা যাচ্ছে, কাঁকর বিছানো রাস্তাটা গেট দিয়ে সোজা ঢুকে কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ে ঘুরেছে। এদিকটা অন্ধকার। নিচে কি আছে বোঝা গেল না ঠিক। বেশ অনেকটা দূরে পাকা দালান দেখা যাচ্ছে। রশিটা ভিতর দিকে এনে হুকটা উল্টো করে দিল রানা। তারপর নেমে গেল ভিতরে।

শক্ত মাটিতে পা ঠেকতেই রশিটা ছুঁড়ে ওপারে পাঠিয়ে দিল রানা। আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে শুনল সে। দূরে চলে গেল গাড়ির মৃদু গুঞ্জন।

আবার একবার পাকস্থলীর মধ্যে সেই বিচিত্র অনুভূতি হলো। তাহলে সত্যিই ঢুকেছে সে নিষিদ্ধ এলাকায়! সামনে পুরো একটা রাত। এর মধ্যেই সব দেখে-শুনে নিতে হবে। উঁচু টাওয়ার থেকে সার্চ লাইটের আলোটা সমস্ত এলাকা চক্কর দিয়ে আবার আসছে ফিরে। দেয়াল থেকে হাত দশেকের মধ্যেই একটা গাছ। ছুটে সেই গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল রানা। পার হয়ে গেল তীব্র আলো।

ব্যাগ থেকে বিনোকিউলারটা বের করল রানা। আমেরিকার উইভার কোম্পানীর তৈরি। জার্মানীর আবিষ্কৃত স্নাইপারস্কোপের মত ইনফ্রা-রেড লেন্স লাগানো আছে এতে। রাতের অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখা যায় এই দূরবীন দিয়ে। চোখে লাগাতেই ধীরে ধীরে কালো অন্ধকার ফিকে হয়ে গেল। ফোকাসিং নবটা ঘুরিয়ে আরও পরিষ্কার করে নিল রানা দূরের গাঢ় অন্ধকারকে। চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

বাম দিকে গেটের দুই ধারে সেন্ট্রিরুমে আলো জ্বলছে। কোনরকম অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা গেল না সেখানে। বোধহয় বিনা বাধায় বেরিয়ে যেতে পেরেছে মিত্রা।

কোথাও লুকোবার জায়গা দেখতে পেল না রানা। ডানদিকে দুই দেয়ালের কোণে একটা সেন্ট্রি ঘর—গজ পঞ্চাশেক দূরেই। গেটের কাছে থরে থরে সাজানো মস্ত আকারের অসংখ্য চারকোনা বাক্সমত কি যেন দেখল রানা। সোজাসুজি তাকালেও সেই রকম কি যেন দেখা যাচ্ছে বহুদূরে। আশেপাশে কোন লোকজন দেখতে পেল না ও।... অনেকগুলো গাছ আছে এলাকার মধ্যে এদিক ওদিক—কিন্তু একটা গাছেও পাতা নেই। ন্যাড়া ডালপালা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে ছোট-বড় হরেক রকমের গাছ। কদাকার লাগছে ওগুলোকে।

হাঁটতে আরম্ভ করল রানা সোজা। পুরো এলাকা সম্পর্কে একটা ধারণা দরকার প্রথমে। সোজা আধমাইল মত পশ্চিমে হেঁটে আবার একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল রানা। বিনোকিউলার চোখে লাগিয়ে দেখল প্রকাণ্ড একটা পাকা একতলা দালান

দেখা যাচ্ছে। প্রায় সিকি মাইল মত লম্বা হবে। চওড়া কত তা বোঝা গেল না যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে। ওখানেই আসল ব্যাপার চলছে বুঝতে পেরে সেদিকেই এগোল রানা। আলোকোজ্জ্বল রাস্তাটা এক লাফে পার হয়ে এলো। আশা করল কেউ দেখতে পায়নি। পুকুর ধার দিয়ে এসে দাঁড়াল সেই প্রকাণ্ড ঘরের পাশে। জায়গায় জায়গায় কাঁচ বসানো। শো-রূমের মত। ভিতরটা অন্ধকার। বিনোকিউলার চোখে তুলে দেখল রানা সমস্ত ঘর ফাঁকা। মেঝেটা বালির। যতদূর দেখা যায় কেবল বালি আর বালি। আর কিচ্ছু নেই ঘরের ভিতর। প্রায় দেড়শো গজ চওড়া ঘরটা।

কিছুই বুঝতে না পেরে রানা ভাবল দেখা যাক ওপাশে কি আছে। এমন সময় চোখে পড়ল দু'জন সেন্ট্রি এগোচ্ছে এদিকে। চট্ করে আড়ালে সরে গেল রানা। ব্যাপার কি! দেখে ফেলেছে নাকি ওরা ওকে?

দেড়শো গজ পার হয়ে রানা দেখল হাত চারেক জায়গা ছেড়ে একই আকারের আরেকটা ঘর ওপাশে। এই ঘরটায় উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। কাঁচ দিয়ে দেখা গেল এ ঘরেও বালির মেঝে। কাঁচটা গরম। ভেতরটা এয়ার-কণ্ডিশন করা নাকি? হঠাৎ রানার চোখে পড়ল অসংখ্য ছোট ছোট পোকা তিড়িং বিড়িঙ লাফাচ্ছে বালির ওপর। প্রকাণ্ড ঘরটায় একটি জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। ভূতুড়ে কারবার নাকি?

এই ঘরটাও পার হয়ে গেল রানা পেছন দিক থেকে। আরেকটা ঘর। এ ঘরটা প্রথম ঘরের মত অন্ধকার। কাঁচে হাত লাগতেই রানা বুঝল ঘরটা অস্বাভাবিক রকমের ঠাণ্ডা। ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আবার বিনোকিউলার তুলল রানা চোখে। ভিতরে চেয়েই চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল ওর। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পঙ্গপালে সারাটা ঘর ছেয়ে আছে। নড়াচড়া করছে না কেউ—এখন ওদের গভীর রাত। উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা। সর্বনাশ! তাহলে তো ডক্টর আলী আকবরের কথাই ঠিক মনে হচ্ছে! আর্টিফিশিয়াল উপায়ে ল্যাবরেটরিতে ব্রীড করছে এরা অসংখ্য পঙ্গপাল! ঘরের ভিতর মরুভূমির আবহাওয়া তৈরি করেছে এয়ার-কণ্ডিশনিং করে।

চতুর্থ ঘরটায় দ্বিতীয় ঘরের মত উজ্জ্বল আলো। কাঁচে চোখ রেখেই শিউরে উঠল রানা। বালি দেখা যাচ্ছে না। মাটি থেকে চার ফুট উঁচু হয়ে সারা ঘরময় বিছিয়ে আছে পঙ্গপাল। একটার ওপর আরেকটা, তার ওপর আরেকটা চড়ে। এগুলো আকারে আর-একটু বড়—পূর্ণ অ্যাডাল্ট। একটার গায়ে লেগে আছে আরেকটা। ডক্টর আকবরের ভাষায় ফেজ গ্রিগেরিয়া, লম্বা বাঁকানো পা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে একে অন্যকে। মারামারি করছে নিজেদের মধ্যে। সবচাইতে নিচে যেগুলো আছে তাদের কথা ভাবতেই দম বন্ধ হয়ে এল রানার। আপনাআপনি কয়েকবার গা-টা শিউরে উঠল তার এত পোকা দেখে। সিকি মাইল লম্বা, দেড়শো গজ চওড়া, চারফুট উঁচু! শুধু পঙ্গপাল আর পঙ্গপাল!

আবার এগোল। আরও একটা ঘর দেখা গেল একই আকারের। কিন্তু এর মধ্যে হরেক রকম যন্ত্রপাতি এবং মানুষ দেখা গেল। বাতি জ্বলছে এই ঘরটায়। দুই পা পিছিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল রানা। বুঝল এটাই আসল ল্যাবরেটরি।

ঘরের মধ্যে পনেরো ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা বিশিষ্ট একটা তারের জাল ঘেরা

খাঁচার ভিতর ঠাসাঠাসি করে পঙ্গপাল ভরা। মাটিতে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে একটা ন্যাড়া গাছের আড়ালে দাঁড়াল রানা। পঙ্গপাল ভর্তি খাঁচাটার পঁচিশ গজ দূরে আরেকটা সেই সমান খালি খাঁচার মুখ খোলা। একজন চশমা পরা লোক সেই খাঁচার পিছনে কি একটা জিনিস ডান হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ধুতিটা উড়ছে জোর বাতাসে। রানা বুঝল প্রবল বাতাস বইছে পঙ্গপাল ভরা খাঁচাটার দিকে। ধুতি পরা লোকটা বাম হাতে ইশারা করতেই পঙ্গপালের খাঁচার মুখ খুলে গেল। হুড়মুড় করে বেরুতে থাকল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল। বাতাসের প্রতিকূলে উড়ে তিন মিনিটের মধ্যে সব গিয়ে ঢুকল খালি খাঁচাটার মধ্যে। মুখ বন্ধ হয়ে গেল সে খাঁচার। রানা ভাবল, নিশ্চয়ই মোলাসেস সেন্ট।

বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে পোকাগুলোকে। এই সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে দিনরাত নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে শ' পাঁচেক একনিষ্ঠ লোক পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বনাশ করবার জন্যে। এদের দূরদর্শী পরিকল্পনার নিষ্ঠুর ভয়াবহতা চিন্তা করে এদের বুদ্ধি এবং শক্তির তুলনায় রানার নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হলো। ঠাণ্ডা মাথায় এরা কতখানি ভয়ঙ্কর এবং মারাত্মক বিদ্বেষপূর্ণ কাজে লিপ্ত হতে পারে ভাবতে গিয়ে এদের প্রতি প্রবল একটা ঘৃণা অনুভব করল সে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে এরা নিজেদের হিংস্রতা চরিতার্থ করবার জন্যে।

বিভিন্ন রকম কাজ চলছে এই ল্যাবরেটরিতে। নানান রকম অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির একাংশ দেখতে পেল রানা। চট্ করে পঞ্চম ঘরটার দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল সে হঠাৎ। একটা পায়ের শব্দ শোনা গেল না? এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝল মনের ভুল। আরও কি আছে সব দেখতে হবে। আঁধারের মধ্যে দিয়ে দ্রুত হেঁটে দেড়শো গজ প্রস্থ পার হয়ে এলো রানা। নাঃ। আর ঘর নেই। পঞ্চমটাই শেষ। একটা উঁচু বালির ঢিবি। দূরে কয়েকটা সুদৃশ্য বাংলো। শক্তিশালী জেনারেটর চলছে কাছেই—পাশে পানি ঠাণ্ডা হওয়ার ফোয়ারা। তারপরই চোখ পড়ল রানার খাঁচাগুলোর ওপর। শত শত ১৫ × ১৫ × ১৫ ফুট খাঁচা লম্বালম্বি ভাবে সাজিয়ে রাখা আছে পঞ্চম ঘরটার গা ঘেঁষে। প্রত্যেকটা খাঁচায় ঠাসাঠাসি করে ভর্তি পঙ্গপাল।

রানা ভাবল ডক্টর আলী আকবরের দেয়া ম্যাটারিজিয়াম সলিউশনটা এখনই ছড়াতে আরম্ভ করে দেবে, না আগে সবটা এলাকা দেখে নেবে? গোটা পশ্চিম দিকটা বাকি রয়ে গেছে। আগে সবটা দেখে নেয়াই ভালো! রাত আরেকটু হোক। হাতঘড়ির দিকে চাইলো রানা। সাড়ে দশটা বাজে। দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে কখন টের পায়নি সে। একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করল ওর খুব। কিন্তু উপায় নেই এখন।

হঠাৎ মাথার ওপর ঘর-ঘর শব্দ শুনে চমকে উঠল রানা। ওভারহেড ক্রেন। আড়ালে সরে দাঁড়াল সে। লোহার তারের মাথায় লাগানো হুক নেমে এসে একটা খাঁচা শূন্যে তুলে নিল। রানাকে দেখতে পায়নি ক্রেন-চালক। আলো পড়তেই রানা দেখল খাঁচার ওপর একটা টিনের পাতে ইংরেজিতে লেখা যশোর। তাহলে এই খাঁচা চললো যশোর বর্ডারে। ক্রেনটা চলে যেতেই বিনোকিউলার চোখে তুললো রানা। দেখল যতগুলো দেখা যায় সবগুলোর উপরই লেখা আছে যশোর। সবশেষের খাঁচাটা একটু বাঁকা হয়ে রয়েছে—সেটাতেও পড়ল রানা, যশোর।

তাহলে! প্রত্যেকটা জেলার জন্যে এতগুলো করে পঙ্গপাল যাচ্ছে। অন্যান্য জেলার খাঁচা কি গন্তব্যস্থলে রওনা হয়েছে? ওভার-হেড ক্রেনটাকে অনুসরণ করবে ভেবে এক পা এগিয়েছে, অমনি পিছন থেকে আওয়াজ এলো, 'খবরদার! মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।' হিন্দী।

ঘুরে দাঁড়িয়েই গুলি করল রানা। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে আওয়াজ হলো, 'দুপ!' ছিটকে লোকটার হাতের সাব-মেশিনগানটা পড়ে গেল মাটিতে। তারই ওপর আছড়ে পড়ল লোকটা। রানা বুঝল, একটু আগে দেখা দু'জন প্রহরীর একজন হবে। নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছিল ওকে। সঙ্গে সঙ্গেই দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দ্বিতীয়জন।

'পাকাড় লিয়া?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হাঁ,' রানা উত্তর দিল।

কিন্তু গলার স্বরেই চিনে ফেলল সে, তাছাড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে রানার হাতে সাব-মেশিনগানটা নেই। মুহূর্ত মাত্র সময় না দিয়ে দ্বিতীয় গুলি করল রানা। এই লোকটাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনে, টুঁ শব্দটি না করে। নিজের শার্ট প্যান্টের ওপর প্রথম প্রহরীর কাপড়চোপড় পরে নিল রানা। তারপর দুটো মৃতদেহ আর একটা সাব-মেশিনগান বালি চাপা দিয়ে দিল। ততক্ষণে আরও একটা খাঁচা তুলে নিতে ফিরে এসেছে ওভার-হেড ক্রেন। চুপচাপ মাটিতে পড়ে রইল সে।

ওটা চলে যেতেই দ্রুত কাজ সারার তাগিদ অনুভব করল রানা। এই দু'জন প্রহরীর অনুপস্থিতি টের পেতে বেশি সময় লাগবে না এদের। তার মধ্যেই চেষ্টা করতে হবে এখান থেকে বেরোবার। ব্যাগ থেকে স্প্রে-গান ফিট করা সলিউশনের কৌটো বের করে পকেটে রাখল রানা। তারপর সাব-মেশিনগানটা তুলে নিল হাতে। ইছাপুর গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরির তৈরি পয়েন্ট থ্রী-এইট ক্যালিবারের গান। বিশ রাউণ্ডের ম্যাগাজিন। চমৎকার হালকা যন্ত্রটা।

খাঁচাগুলোর পাশ দিয়ে খোয়া বিছানো রাস্তায় গিয়ে উঠল রানা। তারপর আলোকিত রাস্তার ওপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে এগোল ক্রেনটা যেদিকে গেছে সেদিকে। কিছুদূর পেছনে একটা গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ পেল সে। হেড লাইট জ্বলে উঠল। দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করল রানার—কিন্তু পালাতে গেলেই সন্দেহ হবে। টিপ্ টিপ্ করে জোর হার্টবিট আরম্ভ হয়ে গেল রানার। পিছন ফিরে চাইল না সে। পাশ কাটিয়ে চলে গেল জিপ। কোন রকম সন্দেহ করেনি ওকে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বাম দিকে চেয়ে দেখল রানা হাজার হাজার খাঁচা ভর্তি পঙ্গপাল থরে থরে সাজানো। সিলেট-কুমিল্লা-চিটাগাং লেখা খাঁচাও দেখল রানা। কী বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছে জয়দ্রথ মৈত্র, ভাবতেই বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে ওর। দেখল, ওভার-হেড ক্রেনটা তখন ফিরছে গেটের কাছ থেকে। ওদিকেও আছে নাকি? ডান দিকে মোড় ঘুরল রানা। গেটের কাছেই রাস্তার দুইপাশে অসংখ্য খাঁচা জমা করা। প্রথমে এখানে ঢুকে রানা ওগুলোকে বাক্স মনে করেছিল।

পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্প্রে-গানটা বের করে প্রত্যেকটা খাঁচায় একটু করে

সলিউশন স্প্রে করল রানা। ওষুধের নামটা জানে সে, কিন্তু কেন পঙ্গপালের কারবার দেখলে এটা ছড়াতে বলেছেন ডক্টর আকবর তা জানে না রানা। ব্যস্ততার মধ্যে সেটা আর জানা হয়নি। রানা ভেবেছিল ছড়ালেই বুঝি মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে এই কোটি কোটি পঙ্গপাল। কিন্তু কিছুই হলো না। অদ্ভুত কিছুই ঘটল না। একটু নিরাশ হলো সে। গুণ নষ্ট হয়ে যায়নি তো ওষুধের?

দৃঢ় পদক্ষেপে ফিরে এল সে রাস্তা দিয়ে পশ্চিম দিকের খাঁচার সামনে। পথে মোড়ের ওপর সেন্ট্রি পোস্টটা খালি দেখে বুঝতে পারল এই চেক পোস্ট থেকেই দু'জন প্রহরী ওকে অনুসরণ করেছিল। আলোকিত রাস্তাটা পার হবার সময় হয়তো রানাকে দেখে ফেলেছিল ওরা।

বেশ অনেকক্ষণ সময় লাগল পশ্চিম দিকের খাঁচাগুলোয় স্প্রে করতে। তারপর এগিয়ে গিয়ে আবার সেই প্রথম ঘরটার সামনে দাঁড়াল রানা। দরজা তালা বন্ধ। এদিক দিয়ে চেষ্টা করে লাভ নেই। পাশাপাশি দুই ঘরের মাঝখান দিয়ে এগোল সে। পনেরো গজ গিয়েই কাঁচের জানালা পেল। মেশিনগানের মাথা দিয়ে এক ঘায়ে খানিকটা কাঁচ ভেঙে ফেলল সে। অল্প খানিকটা সলিউশন স্প্রে করে দ্বিতীয় ঘরটায়ও তাই করল। তারপর বেরিয়ে এল রাস্তায়; আবার ঢুকল তৃতীয় এবং চতুর্থ ঘরের মাঝ রাস্তা দিয়ে, সেখানে কাজ সেরে এল, কিন্তু পঞ্চম ঘরটায় কিছুই করতে পারল না সে। পূর্ণোদ্যমে কাজ চলেছে সেখানে। যশোর লেখা খাঁচার গোটা পনেরোতে দেয়ার পরই শেষ হয়ে গেল সলিউশন। রানার কাজও শেষ। আর কিছুই করার নেই ওর। ফেলে দিল স্প্রে-গানটা ড্রেনের মধ্যে।

করবার নেই কেন? উরুতে বাঁধা চামড়ার খাপের ভিতর থেকে ছুরি বের করে এক বর্গফুট আন্দাজ কাটতে আরম্ভ করল সে তারের জাল। রাতের বেলা ওরা কিছুই টের পাবে না। এরাও বেশ চুপচাপ বসে থাকবে খাঁচার মধ্যে। ডক্টর আলী আকবরের কথাটা মনে পড়ল। 'রাত হলো কি কাত হলো।' রাতে নড়াচড়া করবে না ওরা, কিন্তু সকাল হলেই ফুরফুর করে সব বেরোবে খাঁচা থেকে। পশ্চিম বাংলার ওপর দিয়ে এগোবে ওরা সমস্ত সবুজ মুছে দিতে দিতে। একটা অদ্ভুত আনন্দ শিহরণ অনুভব করল রানা। শত্রুর অস্ত্র তাদেরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার মধ্যে তৃপ্তি আছে।

গোটা পাঁচেক খাঁচা আর কাটতে পারল না রানা। খটাং করে দরজা খুলে গেল ল্যাবরেটরির। এক ঝলক আলো এসে পড়ল খাঁচাগুলোর ওপর। একটা খাঁচার আড়ালে সরে গিয়ে রানা দেখল চারজন লোক বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। চলে গেল তারা হিন্দীতে কথা বলতে বলতে মাঠের মধ্যে দিয়ে বাংলোগুলোর দিকে। খোলাই থাকল দরজাটা। আলোর মধ্যে আর কাজ করা সম্ভব নয়, ছুরিটা যথাস্থানে গুঁজে রেখে সাব-মেশিনগানটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। পঞ্চম ঘরের বৈজ্ঞানিকরা শিশি-বোতল-টেস্ট-টিউব আর নানান রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্তই থাকল। হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের সেই খালি চেক পোস্টের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ক্রিং-ক্রিং করে ফোন বাজছে। রিসিভার তুলে নিল কানে। একদমে অনেকক্ষণ বকাবকি করল কোন ওপর-ওয়ালা।

'যতসব গেঁয়ো চাষাভূষো নিয়ে পড়েছি আমি। এতক্ষণ ধরে রিং হচ্ছে কানের মধ্যে কি তুলো গুঁজে রেখেছ, না ডিউটি ফেলে ঘুমোচ্ছিলে?' বকুনি থামল একটু।

'কাছেই পেচ্ছাব করতে গিয়েছিলাম,' রানা উত্তর দিল।

'আর তোমার সঙ্গের ভূতটা?'

'ওকে দেব টেলিফোন?'

'না। আমি জিজ্ঞেস করছি দু'জনে কি একসঙ্গে গেছিলে জল তৈরি করতে? তোমাদের নামে আমি রিপোর্ট করব, তা জানো? এক্ষুণি অ্যালার্ম সাইরেন বাজাতে যাচ্ছিলাম।'

'সরি, স্যার,' উত্তর দিল রানা।

'স্যার? স্যার বলছ কেন!'

লোকটার কণ্ঠে সন্দেহ ফুটে উঠল। রানা বুঝল 'স্যার' বলা উচিত হয়নি।

'ভুল হয়ে গেছে।'

'তোমার নম্বর কত?' পরিষ্কার সোজা প্রশ্ন।

'সেভেন্টি-নাইন, সি. পি.।' কাঁধের ওপর পিতলের নম্বর দেখে বলল রানা।

খসখস করে কাগজপত্র ঘাঁটার আওয়াজ এল মৃদু। চেক করল বোধহয় অফিসার ডিউটি-রুটিন। একটু থেমে আবার বলল, 'তৈরি থেকো, এরিয়ার মধ্যে লোক ঢুকেছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। সজাগ দৃষ্টি রাখবে চারদিকে।' রিসিভার ছেড়ে দিল অফিসার।

রাত বাজে দেড়টা।

ব্যাগ থেকে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ বের করে খেয়ে নিল রানা। তারপর ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে নিল কফি। তৃপ্তির সঙ্গে কয়েকটা চুমুক দিয়ে ভাবল ব্যাটারা টের পেল কি করে? নাকি এই টেলিফোনের কথোপকথনেই বুঝে ফেলেছে?

এই চেক-পোস্টটা ত্যাগ করা উচিত। এইভাবে বেশিক্ষণ আর আত্মগোপন করে থাকতে পারবে না সে। মিত্রা যদি আসে তো সেই আগামীকাল রাত আটটায়। কিন্তু এখন যত শিগগির সম্ভব এই এলাকা ছেড়ে বেরোনো দরকার। অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখতে হবে।

ঠিক এমনি সময়ে কাঠের চেক্-পোস্টের বাইরে মৃদু একটা খস্‌খস্ আওয়াজ পেল রানা। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল ওর কান। এত আলো কেন? বুঝল, দেরি হয়ে গেছে। সার্চ লাইটটা স্থির হয়ে আছে এই সেন্ট্রি-পোস্টের ওপর। সাব-মেশিনগানের ওপর হাত পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গেই ফোন বেজে উঠল আবার। রিসিভারটা কানে তুলে শুনল রানা, পরিষ্কার বাংলায় একজন বলছে, 'আমি জয়দ্রথ মৈত্র বলছি। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই, মি. মাসুদ রানা। বিশটা মেশিনগান ধরা আছে আপনার দিকে। কথা না শুনলে এক সেকেণ্ডে ঝাঁঝরা হয়ে যাবেন।'

কথাটা বিশ্বাস করল রানা। কণ্ঠস্বরটাও চিনতে পারল অক্লেশে।

'মেশিনগান আর পিস্তলটা ডেস্কের ওপর রেখে দয়া করে ভদ্রলোকের মত বেরিয়ে আসুন বাইরে।'

চিন্তা করছে রানা। তাহলে ধরা পড়ল সে! ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে ভাল করেই জানা আছে রানার। এখনই বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করবে, না অপেক্ষা করবে সুযোগের? জামার বোতামটা ছিঁড়ে খেয়ে নেবে?

সার্চ লাইটটা সরে গিয়ে অন্ধকার মাঠের ওপর ঘুরে এল একবার। সেই

আলোয় রানা দেখল বিশজন সৈন্য মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর দিকে চেয়ে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সাব-মেশিনগান। রানা স্থির করল অপেক্ষা করবে সে।

'অলরাইট, বাস্টার্ড!' বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

'বেরিয়ে এসো, বাপ। সময় নষ্ট করে লাভ আছে কিছু?'

খুব কাছেই পেছন থেকে মোলায়েম কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বেপরোয়া রানা বেরিয়ে এল বাইরে। খপ্ করে দু'পাশ থেকে দু'জন ধরল ওর হাত। তৃতীয়জন এবার পেছন থেকে এসে পিস্তলটা বের করে নিল ওর ওয়েস্ট-ব্যাণ্ড থেকে। অন্ধকার থেকে এগিয়ে এল মেশিনগান-ধারীর দল। রানার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হয়ে গেছে। দড়াম করে এক লাথি মারল আর্মি লেফটেন্যান্ট রানার পেছন দিকে। দুই পা সামনে এগিয়ে গেল রানা সেই ধাক্কায়।

একটা সুদৃশ্য বাংলোর সামনে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে।

'আসুন, আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, মি. মাসুদ রানা। জানতাম আপনি বাঘের বাচ্চা—পালিয়ে যাবার লোক নন। কলকাতায় পেলাম না, কিন্তু জানতাম এখানে আপনার দেখা পাবই।' হলুদ বীভৎস চোখ মেলে রানার দিকে চেয়ে রয়েছে জয়দ্রথ মৈত্র। ওর মুখে এই প্রথম হাসি দেখল রানা। হাসতে গিয়ে টান লাগতেই জিভ দিয়ে মুখের দুই কোণের ঘা ভিজিয়ে নিল জয়দ্রথ মৈত্র। কেশ-বিহীন প্রকাণ্ড মাথাটার তিন ফুট উঁচুতে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। আলোটা চকচকে মাথায় প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিল রানার।

'কিন্তু আশা করেছিলাম বাইরে ধরা পড়বেন—ভেতরে ঢোকার আগেই।'

পেছন ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করল জয়দ্রথ মৈত্র। পাঁচজন ছাড়া বাকি সবাই পেছনে রয়ে গেল। ওয়েটিংরূমের মধ্যে দিয়ে একটা বিরাট কনফারেন্স হলে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে। প্রকাণ্ড একটা পাক-ভারতের ম্যাপ ঝুলছে একধারের পুরো দেয়াল জুড়ে। মোটা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ঘরের একটা অংশ। চাবি দিয়ে গেটটা খুলে দিল জয়দ্রথ মৈত্র। দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে ভাল করে সার্চ করা হলো রানার সারা দেহ। উরুতে বাঁধা খাপ থেকে ছোরাটা বের করে নেয়া হলো।

'পিস্তলটা কোথায়?'

'এই যে,' রানার ওয়ালথার এগিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট।

সাইলেন্সার খুলে ফেলল জয়দ্রথ মৈত্র। স্লাইড টেনে ছ'টা গুলি বের করে ফেলল মাটিতে। ব্যারেলের গোড়ায় চেম্বারের কাছে বুড়ো আঙুলের নখ রেখে পরীক্ষা করে দেখল গুলি ছোঁড়া হয়েছে কিনা। নলের ভিতরে পাউডারের দাগ দেখে মাথা নাড়ল সে।

'লাশ দুটো কোথায়?' দপ করে জ্বলে উঠল জয়দ্রথের চোখ।

লেফটেন্যান্ট তখন নিচু হয়ে মাটি থেকে গুলিগুলো তুলছিল। রানা দেখল এ-ই সুযোগ। রেঞ্জের মধ্যে আসতেই হঠাৎ ঝেড়ে এক লাথি লাগাল ওর চিবুকের নিচের নরম মাংস লক্ষ্য করে। এমন ঘটনার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। স্টীলের সোল বসানো জুতো সোজা গিয়ে লাগল লক্ষ্যস্থলে। একটা বিকট আওয়াজ করে দুই হাত শূন্যে তুলে চিত হয়ে পড়ল লোকটা মেঝেতে। খুঁটে তোলা গুলিগুলো ছিটকে গেল

চারদিকে। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। কণ্ঠনালী ছিঁড়ে গেছে। আধ মিনিট ছটফট করে জয়দ্রথের চোখের সামনে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

লাল হয়ে গেল জয়দ্রথের ফর্সা মুখ। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল সে। এবার এক ঝটকায় হতভম্ব প্রহরীদের কাছ থেকে ছুটে এল রানা। হাত দুটো তেমনি পেছনে বাঁধা। এক লাফে জয়দ্রথের কাছে চলে এল সে। তলপেট লক্ষ্য করে প্রচণ্ড একটা লাথি চালাল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জয়দ্রথ। চট্ করে এক পা পিছিয়ে ধরে ফেলল রানার পা।

রানার কানে গেল, পেছনের কাউকে জয়দ্রথ বলল, 'খবরদার, গুলি কোরো না!' তারপরই ধাঁই করে একটা রাইফেলের বাঁট এসে পড়ল ওর মাথার ওপর। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মাসুদ রানা।

ঠিক সেই সময় পাশের একটা দরজা দিয়ে স্লীপিং গাউন পরিহিতা স্যালি ডেভন ঢুকল এসে ঘরে। এক মুহূর্ত অবাক হয়ে রানাকে দেখল সে।

'এখন যাও, স্যালি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল স্যালি পাশের ঘরে। শক্ত করে রানার পা বেঁধে ফেলা হলো। জয়দ্রথের ইঙ্গিতে লেফটেন্যান্টের মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে গেল দুইজনে। বাকি দু'জন রানার পা ধরে টেনে হেঁচড়ে জ্ঞানহীন দেহটা নিয়ে এল লোহার গরাদ দেয়া হাজত ঘরটার মধ্যে। তালা লাগিয়ে দিল জয়দ্রথ লোহার গেটে। হাতের ইঙ্গিতে ওদের চলে যেতে বলে টেবিলের ওপর কয়েকটা কাগজ ঘাঁটল কিছুক্ষণ। একটা টেলিফোন করল কোথাও। তারপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে।

ঘণ্টা খানেক পরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। চোখ মেলে দেখল চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোথায় আছে বুঝতে পারল না সে। পিঠের তলায় হাতটা বেকায়দায় পড়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দেহ কাত করে চাপ মুক্ত করল রানা শক্ত করে বাঁধা হাত দুটো। আবার রক্ত চলাচল আরম্ভ হওয়ায় ঝিঁঝি ধরে গেল ডান হাতটায়। বিকারগ্রস্তের মত অনেক আজেবাজে চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকল ওর মাথার মধ্যে। একই কথা বারবার ফিরে আসে—চেষ্টা করেও তাড়াতে পারে না রানা। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল রানার। চোখ বন্ধ করেই শুনল পাশের ঘরে খবর হচ্ছে রেডিওতে। হঠাৎ ভয়ঙ্কর রকম চমকে উঠল রানা। মুহূর্তে ঘুমের রেশ কেটে গেল তার। যুদ্ধ! নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে ভরসা হলো না।

'এ খবর প্রচারিত হচ্ছে রেডিও পাকিস্তান থেকে। আজ ভোর সাড়ে তিনটায় লাহোরের আটারি-ওয়াগা ও বার্কি সেক্টরে কোন রকম যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতিরেকেই সাম্রাজ্যবাদী ভারতের হীন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। অতর্কিত আক্রমণ করে ভারতীয় সৈন্য লাহোর সেক্টরে পাকিস্তানের মূল ভূ-খণ্ডের তিন মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। পাকিস্তানী স্থল বাহিনীর বীর জোয়ানরা বিপুল বিক্রমে শত্রু সৈন্যকে প্রতিহত করছেন। এই মাত্র খবর পাওয়া গিয়েছে—ভারতীয় বিমান বাহিনী ওয়াজিরাবাদে দণ্ডায়মান একটি যাত্রীবাহী রেলগাড়ির ওপর বোমা বর্ষণ করেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান

চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে। জাতির উদ্দেশে আজ প্রেসিডেন্ট যে জরুরী বেতার ভাষণ দান করেছেন তার বাংলা তর্জমা প্রচার করা হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

ব্যাপার কি? যুদ্ধ লেগে গেল? লাহোর আক্রমণ করেছে ভারত!

খবরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো আবার পড়ে শোনানো হলো। মন দিয়ে শুনল রানা। এখন পর্যন্ত পাকিস্তান বিমান বাহিনী আটটি ভারতীয় বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে; স্থল বাহিনীর গুলিতে ভূপাতিত হয়েছে আরও তিনটি! খবরের পরই ভেসে এলো রানার প্রিয় কণ্ঠশিল্পীর বলিষ্ঠ কণ্ঠ:

'রক্তে লিখেছি জন্মভূমির নাম'

সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল রানার। স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর বন্ধু-বান্ধবদের ছবি ফুটে উঠল ওর চোখের সামনে। সমগ্র পাকিস্তানে আজ যুদ্ধ-চাঞ্চল্য, আর সে কিনা পড়ে রয়েছে এখানে নিরুপায় বন্দী অবস্থায়।

এমনি সময় জয়দ্রথ এসে ঢুকল ঘরে। একটা সরু নাইলন কর্ড ধরে টান দিতেই সারা ঘরে উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠল।

'ঘুম ভেঙেছে তাহলে? খবরটা শুনলেন? অবাক লাগছে না?'

পরম পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল জয়দ্রথের মুখে। টেবিলের ওধারের চেয়ারটায় বসল সে। দু'বার হাতে তালি দিতেই দু'জন সিপাই ঢুকল ঘরে। তালা খুলে রানাকে নিয়ে এসে বসানো হলো একটা বিশেষ ভাবে তৈরি লোহার চেয়ারে। মেঝেতে লেফটেন্যান্টের রক্তের দাগ কালচে হয়ে লেগে আছে এখনও। চেয়ারের সঙ্গেই ফিট করা চামড়ার বেল্ট দিয়ে প্রথমে রানার বুক, পেট এবং আলাদা আলাদা করে দুই উরু বাঁধা হলো শক্ত করে; তারপর পায়ের বাঁধন খুলে পা দুটো চেয়ারের দুই পায়ার সঙ্গে বাঁধা হলো। এবার হাতের বাঁধন খুলে কনুই আর কব্জি বেঁধে ফেলা হলো চেয়ারের হাতলের সঙ্গে। একবিন্দু নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না রানার। জয়দ্রথের ইশারায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সিপাই দু'জন।

'আজ আমার বড় আনন্দের দিন, মি. মাসুদ রানা। আজ আমাদের ডি-ডে। দুই-দুইটা বছর কঠোর পরিশ্রম করবার পর আজ আমরা সাফল্য অর্জন করতে যাচ্ছি। তাই অন্যান্য সবাই পৌঁছবার আগেই আপনার সঙ্গে দুটো রসালাপ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।'

একটু নড়ে চড়ে আরাম করে বসল জয়দ্রথ।

'ওই যে চেয়ারটায় বসে আছেন, ওটাকে আমরা বলি "প্যানিক চেয়ার"। কারও কাছ থেকে কোন তথ্য বের করতে হলে ওটা ব্যবহার করি আমি। আমার নিজেরই আবিষ্কার। অনেক রকম কাজ হয় ওতে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের দেশের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন ভদ্রলোক এসে পৌঁছবেন এখানে। স্টেনোগ্রাফারও আসবে দুইজন। তাঁদের সামনে আপনার কাছ থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য বের করে নেয়া হবে নানান কৌশলে। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন কয়েকটা ইলেকট্রিক তার গিয়ে ঢুকেছে চেয়ারটার ভিতর। বারোটা বোতাম আছে আমার হাতের কাছে—একেকটাতে একেক ফল, সময়মত টের পাবেন সব। এখন আমার অতিথিরা এসে পৌঁছবার আগেই আপনাকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু

ওয়াকেফহাল করে নিতে চাই।'

এক টিপ নস্যি নিল জয়দ্রথ মৈত্র।

'গত দুই বছর ধরে আমরা একটা মহা প্রস্তুতি নিয়েছি পাকিস্তানীদের পঙ্গু, নির্জীব, মেরুদণ্ডহীন এক জাতিতে পরিণত করবার জন্যে। তার প্রথম অংশ আপনি রেডিওতে শুনেছেন। এগারো ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য আজ পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে প্রস্তুত। আখনুর থেকে রাজস্থান পর্যন্ত ভারতীয় পদাতিক, পার্বত্য অশ্বারোহী, সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনী আজ আক্রমণোদ্যত। কেবল লাহোরেই দুই ডিভিশন সৈন্য আজ ঢুকে পড়েছে পাকিস্তানের ভেতর। ফিফটিনথ আর সেভেন্থ পদাতিক ডিভিশন। আর টোয়েন্টি থার্ড পার্বত্য ডিভিশন রিজার্ভ রাখা হয়েছে, প্রয়োজন হলে লাগানো হবে। এ ছাড়া কাছেই অমৃতস্বরে আরও এক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়েছে। দুই দিক আক্রমণ করা হয়েছে—আটারি-ওয়াগা এবং বার্কিলাহোর। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ প্রতিহত করবার ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই। এ ছাড়া এয়ারফোর্স তো রয়েছেই সাহায্যের জন্যে। আমাদের Mig 21, Gnat, Hunter, Canberra, Vampire ছাতু করে দেবে পাকিস্তানের দুর্বল Sabre F-86, B-57 এবং F-104. গোটা পৃথিবী জানে আজ সন্ধ্যায় আমাদের সেনাপতি লাহোর ফোর্টে বসে চা খাবেন। আগামীকাল লাহোর দখলকারী বাহিনী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে কাসুর থেকে অগ্রসরমান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে। লাহোরের পর শিয়ালকোট। চুরমার হয়ে যাবে পাকিস্তানীদের মনোবল। সর্বত্র দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা। মাত্র দশদিন লাগবে আমাদের সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে পদানত করতে। এমনই আঘাত হানব—যেন আগামী দু'শো বছরেও সে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। সে ভার গ্রহণ করেছেন আমাদের সেনাপতি। আর পূর্ব পাকিস্তানের ভার পড়েছিল এই আমার ওপর।'

বুকের ওপর বুড়ো আঙুল ঠেকাল জয়দ্রথ মৈত্র।

'আমি ভেবে দেখলাম এই নদী নালার দেশে সৈন্য-বাহিনী পাঠিয়ে খুব সুবিধে হবে না। ট্যাঙ্ক যাবে নরম মাটিতে বসে। তাছাড়া আমাদের সামরিক শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ হওয়া দরকার পশ্চিম পাকিস্তানে। তাই এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করলাম। পঙ্গপাল দিয়ে ধ্বংস করে দেব পূর্ব-পাকিস্তান। সীমান্ত বরাবর খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া-রাজশাহী-দিনাজপুর-সিলেট-কুমিল্লা-চিটাগাং চারদিক থেকে কোটি কোটি পঙ্গপাল ছাড়া হচ্ছে। মাঝরাত থেকেই স্পেশাল ট্রেনে করে রওনা হয়ে গেছে সব পঙ্গপাল গন্তব্যস্থলে। দশ দিনের মধ্যে ধূ-ধূ করবে আপনাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পূর্ব-পাকিস্তান—সবুজের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না কোথাও! ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ লাগবে। না খেতে পেয়ে মারা যাবে লক্ষ-কোটি মানুষ। বাইরে থেকে সাহায্য পাবে না কোন, বাধ্য হয়ে আমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে তখন। হাহাকার পড়ে যাবে সারা দেশ জুড়ে। আমরা তখন দয়া পরবশ হয়ে অনায়াসে দখল করে নেব পূর্ব-পাকিস্তান। বাধা দেয়ার লোক থাকবে না আর।'

নির্বিকার ভাবে শুনছিল মাসুদ রানা। এবার বলল, 'আর চুপচাপ তাই দেখবে পৃথিবী! গাঁজা মারার জায়গা পাওনি, শালা।'

জয়দ্রথ একটা বোতাম স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ করে উঠল রানা

তীব্র একটা বিদ্যুৎ ঝটকা খেয়ে।

'কেউ অশোভন কথা বললে এই বোতামটা সাধারণত টিপি আমি। বারো রকম কৌশলের এটা একটা। আশা করি ভবিষ্যতে আর অভদ্র ভাষা ব্যবহার করবেন না। যাক, যা বলছিলাম। পৃথিবীতে দুর্বলের স্থান নেই। ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা দেশ যা করে সেটাই ন্যায়। তবে হ্যাঁ, প্রতিবাদ হবে, বড় বড় কনফারেন্স হবে, অনেক যুক্তিতর্কের ঢেউ উঠবে-পড়বে, বৃহৎ শক্তিবর্গ বৈঠকের পর বৈঠক বসাবে, আলোচনা চলবে দিনের পর দিন। শেষকালে ছাড়ব আমরা পাকিস্তান। গড়িমসি করে যাচ্ছি-যাব করতে করতে চার-পাঁচ বছর পার হয়ে যাবে। শুষে ছোবড়া বানিয়ে ছেড়ে দেব আমরা পাকিস্তানকে। প্রাণটা কেবল দুর্বলভাবে ধুকপুক করবে—আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। জন্মের পর থেকেই আপনারা যে অবিরাম উদ্বেগের মধ্যে রেখেছেন আমাদেরকে, তাতে সমূলে বিনাশ করা ছাড়া আর কোন পথই ছিল না আমাদের।'

একটু থেমে একটিপ নস্যি নিল জয়দ্রথ মৈত্র। পাশেই রাখা একটা ছোট্ট দামী অলওয়েভ ট্র্যানজিস্টার রেডিও খুলে দিল। প্রেসিডেন্টের ভাষণের অনুবাদ প্রচার করা হচ্ছে।

'ভারতের কামান চিরতরে স্তব্ধ না করা পর্যন্ত দশ কোটি পাকিস্তানী বিশ্রাম গ্রহণ করবে না। ভারত এখনও বুঝতে পারছে না কোন্ জাতির বিরুদ্ধে সে মাথা তুলেছে।'

একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বন্ধ করে দিল জয়দ্রথ রেডিওটা।

'আমার দায়িত্ব ছিল মস্ত বড়, মি. মাসুদ রানা। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমার পঙ্গপাল বাহিনী তৈরি করতে হয়েছে। কত শত কঠিন সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে। ওই যে চারটে ব্রিডিং রুম দেখেছেন—সব এয়ার কণ্ডিশন করা। মরুভূমির আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছে সেখানে। লো হিউমিডিটি, হাই টেম্পারেচার। বছরে ছয়বার ডিম পাড়িয়েছি ওদের দিয়ে। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারবার দিনকে রাত করেছি, রাতকে দিন। এক মাসের জায়গায় এক সপ্তায় পূর্ণ বয়স্ক পঙ্গপাল তৈরি করেছি। স্ত্রী পঙ্গপাল বালুর নিচে দু'শো করে ডিম পেড়েছে। ডিম থেকে পিউপা, তার থেকে লারভা এবং সবশেষে অ্যাডাল্ট। বিশেষ প্রক্রিয়ায় দশ দিনের মধ্যেই ডিম পাড়াবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে নতুন জেনারেশন। চিন্তা করে দেখুন, নইলে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান ছেয়ে ফেলা সম্ভব হত না এত অল্প সময়ের মধ্যে। আমার বম্বে লোকাস্ট, অর্থাৎ Accridium Succinctum আবার চলে হাওয়ার অনুকূলে। যে সময়টাতে ছাড়তে চাই সে সময় হাওয়া বয় দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে। সিলেট-কুমিল্লা-চিটাগাং-এর জন্যে চিন্তা নেই, কিন্তু আপনাদের পশ্চিম সীমান্তে ছাড়লে সব চলে আসবে আমাদের নিজেদেরই দেশে। তাই এদের স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। Molasses…'

'ওসব আমাদের জানা আছে। আপনাদের কার্যকলাপ সবই আমাদের নখ-দর্পণে। ওই গন্ধ ছড়িয়ে পঙ্গপালগুষ্টি হাওয়ার প্রতিকূলে নেয়ার চেষ্টা করছেন আপনারা।'

'হ্যাঁ। আজ সকালেই আমাদের সব ক'টা বোমা ফেটে সীমান্ত জুড়ে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে আবার আরম্ভ করল জয়দ্রথ মৈত্র।

'আপনাদের পি. সি. আই.-চীফ সেগুলো তুলে অকেজো করে ফেলবার জন্যে লোক লাগিয়েছে, এই তো বলতে চাচ্ছেন? সে সব আমার জানা আছে। তাই সকাল বেলা প্লেনে করে নতুন একদফা গন্ধ ছড়ানো হয়েছে। দুপুরে চারটে Mig-21 যাবে আবার একদফা এক্সট্রাক্ট ছড়াতে। কয়দিক সামলাবে রাহাত খান? ও হচ্ছে গরু-খেকো নেড়ে মুসলমান। বুদ্ধির খেলায় আমার কাছে সে একটি তৃতীয় শ্রেণীর গর্দভ মাত্র।'

আবার একবার খুলল জয়দ্রথ রেডিওটা। শেষ হয়ে এসেছে প্রেসিডেন্টের বাণী।

'—কঠোরতম আঘাত হানার জন্য আপনারা তৈরি হন। এগিয়ে যান, শত্রুর মোকাবেলা করুন। আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। শয়তানের ধ্বংস অনিবার্য। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।'

পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল। বন্ধ করে দিল জয়দ্রথ রেডিওটা বিতৃষ্ণার সঙ্গে।

'পঙ্গপালের আপনারা কি দেখেছেন? ১৯৬২ সালে করাচির ওপর দিয়ে যে ছোট্ট দলটা উড়ে গিয়েছিল তার ফলেই সারাদিন সূর্যের মুখ দেখতে পায়নি করাচিবাসী। ওটা ছিল মাত্র ৯৫ মাইল লম্বা, ৮ মাইল চওড়া আর উচ্চতা ছিল আধ মাইল। আর এখানে আমি প্রত্যেক জেলার জন্যে ছাড়ছি এর পাঁচগুণ বড় বড় এক একটা করে দল। দুঃখ শুধু এই, আমার ইচ্ছেমত ছাড়তে পারলাম না। সেনাপতি তৈরি হতে সময় নিয়ে নিলেন একটু বেশি। আর মাস দুই আগে ছাড়তে পারলে অতুলনীয় ক্ষতি করতে পারতাম।'

একবার মুখের দুই কোণ ভিজিয়ে নিল সে। দেখল রানা ঝিমোচ্ছে—ওর কথা শুনছে না। একটা বোতাম টিপল সে। গরম হয়ে উঠছে চেয়ারটা। অবাক হয়ে রানা দেখল জয়দ্রথ হাসছে। লাল হয়ে উঠেছে চেয়ারটা। ধোঁয়া বেরোতে আরম্ভ করল রানার কাপড় থেকে—আগুন ধরে যাচ্ছে। আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা। সুইচটা অফ করে দিল জয়দ্রথ।

'ইচ্ছে করলে অসম্ভব ঠাণ্ডাও করা যায় অন্য বোতাম টিপে। যাক, যা বলছিলাম। অনেক বাধা বিপত্তি। একবার তো একটা ফাঙ্গাস রোগ হয়ে তিন দিনে শেষ হয়ে গেল সব পঙ্গপাল। অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। ম্যাটারিজিয়াম থেকে হয়...'

'কি বললেন?' চমকে তাকাল রানা জয়দ্রথের মুখের দিকে।

'ম্যাটারিজিয়াম। কেন, নামটা শুনেছেন নাকি?'

হঠাৎ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার মুখ। বত্রিশ পাটি দাঁত বের হয়ে গেল ওর। অবাক হয়ে বক্তৃতা বন্ধ করল জয়দ্রথ মৈত্র।

'হাসছেন কেন?'

'আনন্দ চেপে রাখতে পারছি না, তাই।'

'হঠাৎ এত আনন্দের কারণ?'

'আমার দেশকে আমি রক্ষা করেছি—তাই বড্ডো আনন্দ হচ্ছে।'

জয়দ্রথ ভাবল, হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ব্যাটার? অতিরিক্ত নার্ভাস

হলে এমন হয় অনেক সময়। কিন্তু হাসিটা তো বিকারগ্রস্তের হাসি বলে মনে হচ্ছে না।

'ফাংগাস রোগের কথা বললেন না? ম্যাটারিজিয়াম? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওই রোগটা বয়ে এনেছিলাম আমি পাকিস্তান থেকে। প্রত্যেকটা খাঁচায় ওই সলিউশন স্প্রে করেছি আমি গত রাতে; কিন্তু জানতাম না কি ক্ষতি হবে আপনাদের। এখন বুঝলাম। কালকের মধ্যে সমস্ত পঙ্গপাল মরে ভূত হয়ে যাবে আপনার। এত পরিশ্রম করেও শেষ কালে হেরে গেলেন, মৈত্র মশাই।'

মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল জয়দ্রথের, নিজের অজান্তেই নস্যির কৌটোটা তুলে নিল টেবিল থেকে। ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ঢোক গিলল সে।

'অসম্ভব!'

'খুবই সম্ভব। আপনার পঞ্চম ল্যাবরেটরির পাশে যেখানে যশোর লেখা খাঁচাগুলো ছিল কাল রাতে…ওইখানে ড্রেনের মধ্যে খোঁজ করলে পাবেন, খালি কৌটোটা পড়ে আছে। তুলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ওইখানে এসেই শেষ হয়ে গিয়েছিল সলিউশন। তাই বাকি খাঁচাগুলোর জাল আমি ছুরি দিয়ে কেটে ফাঁক করে দিয়েছি। জালগুলোও ওখানেই পাবেন। একটু বেলা উঠতেই খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেছে ওরা সব—মিথ্যে কথা নয়, খোঁজ নিয়ে দেখুন, এতক্ষণে পশ্চিম-বাংলার খেত খামার চষে বেড়াচ্ছে ওগুলো।'

জয়দ্রথ বুঝল, মিথ্যে কথা বলছে না রানা। সমস্ত মুখ কুঁচকে গেল ওর। ধক-ধক জ্বলে উঠল হলুদ লম্বাটে চোখ জোড়া। শেষ কালে এর হাতে পরাজয় হলো তার? একটা সাধারণ পাকিস্তানী স্পাই এসে শেষ করে দিল তার এত দিনের সাধনা, এত পরিশ্রম! একজন লোক পাঠিয়ে দিল জয়দ্রথ কৌটোটা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে দেবার জন্যে। ল্যাবরেটরিতেও ফোন করে কয়েকটা নির্দেশ দিল সে।

জয়ের উল্লাসে রানা বলে চলল, 'আর, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের রাহাত খান সম্পর্কে সতর্ক হয়ে মন্তব্য করবেন। আমার হাত খোলা থাকলে চড়িয়ে আপনার দাঁত কয়টা ফেলে দিতাম ওই অশোভন উক্তির জন্যে।'

আবার বোতামে হাত দিতে যাচ্ছিল জয়দ্রথ মৈত্র, কিন্তু টেলিফোনটা বেজে উঠতে সেদিকে হাত বাড়াল। রিসিভার কানে তুলেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল জয়দ্রথ মৈত্রের।

'কি বললে? খবর এসেছে খাঁচা খালি? (কিছুক্ষণ চুপচাপ শুনল) না, এখন আর কোন ইনসেকটিসাইড দিয়েই ফেরানো যাবে না। যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে।…কোথায় বললে? বারাসত? (মাথা নাড়ল হতাশ ভাবে) এতগুলো লোক কেউ লক্ষ করল না এত খাঁচা সব কাটা?…না, ওখানে জানিয়ে কি হবে?…কি বললে? প্রধানমন্ত্রী? ওদিক আমি সামলাব। আমি আসছি এক্ষুণি।'

রানার প্রতি তীব্র দৃষ্টি হেনে উঠে দাঁড়াল জয়দ্রথ মৈত্র। তেমনি মুচকে মুচকে হাসছে রানা। বলল, 'হেরে গেলেন, মৈত্র মশাই। এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে হবে আপনাদের সেনাপতিকে বেত খাওয়া কুকুরের মত। আমাদের সামরিক শক্তি আপনাদের ভুল ভাঙিয়ে দেবে অল্পদিনেই।'

'আমি আসছি! তারপর তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করছি, শয়তান।'

একটা সুইচ টিপে দিয়ে নিশিতে পাওয়া লোকের মত দিশেহারা পা ফেলে বেরিয়ে গেল জয়দ্রথ মৈত্র।

খুব নিচু ভোল্টে অত্যন্ত হাই অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট চালু হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। দশ মিনিট পর পর ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে ভেঙে যাচ্ছে রানার ঘুম। আবার ঘুমিয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে ভাঙা ভাঙা ভাবে চিন্তা করছে সে অনেক কথা। মাঝে মাঝে চেষ্টা করছে বাঁধন খুলতে—শেষে হাল ছেড়ে দিল। এ বাঁধন খুলবার নয়। বাজে কয়টা এখন? জয়দ্রথ ফিরবে কখন? কখন আরম্ভ হবে জয়দ্রথের আসল নির্যাতন? তাড়াতাড়ি করছে না কেন? যা ঘটার ঘটে যাক না। এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্যে অপেক্ষা করা যায় না।

মাথার ওপর দিয়ে কত যে জেট গেল ঝাঁকে ঝাঁকে তার ইয়ত্তা নেই। রানা ভাবল, এ এক অদ্ভুত নির্যাতন বের করেছে তো জয়দ্রথ। যখন সে ঘুমাতে চাইছে, তখন কে যেন জাগিয়ে দিচ্ছে ওকে···আবার জেগে থাকবার চেষ্টা সত্ত্বেও কে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ থাকলে প্যাগল হয়ে যাবে সে। ঘুমটা যতবার ভাঙছে দুঃস্বপ্ন দেখে ভাঙছে। টপ টপ করে ঘাম পড়ছে সর্বাঙ্গ থেকে।

একটা ছায়া কেঁপে উঠল ঘরের ভেতর। চমকে ঘাড় ফেরাল রানা। স্যালি ডেভন। প্রথমেই পা টিপে টিপে বোতামগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। আবার ঘুমিয়ে পড়ছিল রানা—সুইচ অফ করে দিতেই ঘুমের রেশটা গেল ছুটে। চটপট রানার বাঁধন খুলতে আরম্ভ করল এবার স্যালি। হাতের বাঁধন আগে খুলল, তারপর পায়ের। বিস্মিত রানা নিজেই তাড়াতাড়ি গলা, বুক এবং পেটের বেল্টগুলো খুলে ফেলল। আধ মিনিটের মধ্যেই বাঁধনমুক্ত রানা উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'আপনি কোত্থেকে?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'জয়দ্রথের সঙ্গে আছি ব্যাঙ্কক ফিরে যাবার আগের ক'টা দিন। ক্যাথির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। আপনার ঋণ আমরা কোনদিনই শোধ করতে পারব না। আমার বোন ভুল করেছিল—ওকে ক্ষমা করতে পারবেন না, মি. রানা?'

'ওসব পরে হবে, স্যালি। এখন বাজে কয়টা?'

'সাড়ে সাতটা।'

'ক'জন সশস্ত্র লোক আছে এ বাড়িতে?'

'আট-দশ জন। কিন্তু সম্পূর্ণ এরিয়ার অর্ধেক প্রহরীকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে আজ।'

'আমার পিস্তলটা কোথায় জানেন?'

'না।'

'প্রহরীদের চোখে না পড়ে এ বাড়ি থেকে বেরোবার কোন পথ আছে?'

'তা ঠিক বলতে পারব না। গতকালই প্রথম এসেছি আমি এখানে।'

'জয়দ্রথ কখন আসবে বলে গেছে কিছু?'

স্যালিকে আর জবাব দিতে হলো না। একটা জীপ জোরে ব্রেক কষে স্কিড করে থামল গাড়ি-বারান্দায়। স্যালিকে পাশের ঘরে যাবার জন্যে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ইঙ্গিত করল রানা। দ্রুত চোখ বুলাল সে ঘরের চারধারে। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন একটা জিনিসও চোখে পড়ল না ওর। টেবিলের ওপর থেকে দুটো

কাঁচের পেপার ওয়েট তুলে নিল হাতে। কয়জন লোক আসছে কে জানে। দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়াল রানা দরজা থেকে চার হাত দূরে। পায়ের শব্দ শুনে রানা আন্দাজ করল দু'জন লোক এগিয়ে আসছে এই ঘরের দিকে।

কথা বলতে বলতে ঢুকল জয়দ্রথ মৈত্র। পেছনে পেছনে এল কোমরে রিভলভার ঝোলানো একজন পদস্থ মিলিটারি অফিসার।

'হোয়্যার ইজ দা সোয়াইন?' জিজ্ঞেস করল অফিসার।

প্যানিক চেয়ারটা খালি দেখেই আঁতকে উঠল জয়দ্রথ। ধাঁই করে একটা ভারি পেপার ওয়েট গিয়ে লাগল মিলিটারি অফিসারের নাক বরাবর। নাকে হাত দিয়ে বসে পড়ল প্রকাণ্ড চেহারার লোকটা, তারপর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে জ্ঞান হারিয়ে। দ্বিতীয় ঢিল ছুঁড়ল রানা জয়দ্রথের মাথা লক্ষ্য করে। দ্রুত মাথা সরিয়ে নিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিল জয়দ্রথ রানাকে। সোজা ওপাশের দেয়ালে লেগে চৌচির হয়ে গেল কাঁচের পেপার ওয়েট।

বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা জয়দ্রথের ওপর। কিন্তু নাকে-মুখে দমাদম কয়েকটা ঘুসি খেয়ে থমকে দাঁড়াল সে। শক্তিতে কিছু কম হলেও অত্যন্ত দ্রুত হাত-পা চালাতে পারে জয়দ্রথ মৈত্র। সেই সঙ্গে বুদ্ধিও। পেছন ফিরেই দৌড় দিল সে। রানা ছুটল পেছনে, অফিসারের কোমর থেকে রিভলভার নিতে গেলে হারিয়ে ফেলবে জয়দ্রথকে, তাই খালি হাতেই। চিৎকার করে লোক ডাকছে জয়দ্রথ। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে পেছনের দিকের বারান্দায় পড়ল—তারপর ড্রইং-রূমের পাশ দিয়ে ছুটল সে। যাবার সময় ড্রইং-রূমের দরজায় লাগানো একটা কলিং বেল টিপে দিল একবার। পেছন থেকে ধাওয়া করে প্রায় ধরে ফেলবে রানা এমন সময় হঠাৎ রুখে দাঁড়াল জয়দ্রথ মৈত্র। হাতে উদ্যত ছুরি।

সময় মত সাবধান না হলে ঢুকে যেত ছুরিটা রানার বুকে। ওর হাত ধরে ফেলল রানা, তারপর যুযুৎসুর এক প্যাঁচে দড়াম করে আছড়ে ফেলল মাটিতে। মাথাটা জোরে ঠুকে গেল মেঝেতে। কিন্তু ছুরিটা ছাড়ল না সে হাত থেকে। প্রচণ্ড ওজনের গোটা দুই লাথি লাগাল রানা জয়দ্রথের পাঁজরে। কুঁকড়ে গেল ওর দেহটা যন্ত্রণায়। বিলিয়ার্ড বলের মত চকচকে গোল মাথায় একটা লাথি মারতেই বুদ্বুদের মত ফুলে উঠল জায়গাটা।

এমন সময় বুটের আওয়াজ পাওয়া গেল। দৌড়ে এদিকে আসছে কয়েকজন লোক। চিৎকার করবার চেষ্টা করল জয়দ্রথ, কিন্তু ভাঙা একটা কর্কশ শব্দ বেরোল ওর মুখ থেকে। মৃত্যুর বিভীষিকা ওর চোখে-মুখে। আরেকটা লাথি মারল রানা ওর মাথায়। সাময়িক ভাবে জ্ঞান হারাল জয়দ্রথ। এবার জয়দ্রথের একটা হাত ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল রানা। ডাইনিং রূম।

এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। বুকের ওপর চেপে বসে গলা টিপে ধরল রানা জয়দ্রথের। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেল জয়দ্রথ। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে হলুদ চোখ দুটো। তখনও ছুরিটা ধরা আছে ওর হাতে। চেষ্টা করল সে একবার। ডান হাতটা ওঠাল দুর্বলভাবে। রানার পিঠে বসাবার চেষ্টা করল ছুরি। খোঁচা খেয়েই গলা থেকে একটা হাত সরিয়ে কেড়ে নিল রানা ছুরিটা। এবার পা দুটো মাটিতে আছড়ে প্রহরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল জয়দ্রথ। রানা দেখল এভাবে এর

পেছনে সময় নষ্ট করা যায় না, ধরা পড়ে যাবে। নিষ্ঠুরভাবে ওর গলায় ছোরা চালাল সে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। ছিটকে এসে ল্যগল রানার চোখে মুখে। মাথাটা একদিকে হেলে পড়ল জয়দ্রথের। ফাঁক হয়ে আছে গলা। কলকল করে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝেতে।

ছুরি হাতে প্রস্তুত থাকল রানা। কিন্তু না। ডাইনিং রুমটা ছাড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল ওরা সামনে। পর্দার নিচ দিয়ে ওদের বুট দেখতে পেল রানা। জনা ছয়েক হবে।

এবার ধীর পায়ে পেছনের দিকে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। অন্ধকার হয়ে গেছে বাইরেটা। যদি এখান থেকে বেরোতে না পারে তবে যতগুলোকে সম্ভব শেষ করে তারপর মৃত্যুবরণ করবে সে। হঠাৎ পঞ্চাশ গজ দূরে বালির ঢিবিটার কথা মনে পড়ল ওর। মৃতদেহ দুটোর সঙ্গে সাব-মেশিনগানটার কথাও মনে এল। এতক্ষণ পর্যন্ত ওগুলো যথাস্থানে আছে কিনা কে জানে। আবার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল করিডরে। দরজা খুলে বাড়িটার পেছন দিকে বেরিয়ে এল রানা। সার্চ লাইটের আলোটা একবার ঘুরে যেতেই দৌড় দিল সে। পাওয়ার জেনারেটারের পাশ দিয়ে সামনের আলোকিত খোলা মাঠে পড়ল এবার। এক ছুটে চলে এল বালির ঢিবিটার কাছে।

আছে। টান দিয়ে সাব-মেশিনগানটা বের করে বালি ঝেড়ে নিল রানা। একজন মৃত প্রহরীর কব্জি পর্যন্ত হাত বেরিয়ে পড়ল বালির নিচ থেকে। রওনা হতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল রানা, টেনে বের করল সে মৃতদেহটা। দুটো এক্সট্রা ম্যাগাজিন টান দিয়ে বের করল মৃত ব্যক্তির কোমরের বেল্ট থেকে।

ছয়জন প্রহরী রাইফেল হাতে জয়দ্রথের বাংলোর পেছন দিয়ে বেরিয়ে এল। জয়দ্রথের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই, তাই বেরিয়ে এসেছে পেছনের খোলা দরজা দিয়ে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ট্রিগার টিপল রানা। বিকট চিৎকার করে মাটিতে আছড়ে পড়ল সব ক'জন। এবার ছুটল রানা ল্যাবরেটরি ঘরগুলোর পেছন দিয়ে সোজা উত্তর দিকে। কিন্তু এক নম্বর ঘরটার পেছনে পৌঁছতেই আকাশ কাঁপিয়ে বেজে উঠল সাইরেন। এলাকার সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে বিপদ-সঙ্কেত দিয়ে। চারদিকে খবর হয়ে গেছে। গেট থেকে আট দশজন ছুটল সোজা রাস্তা ধরে জয়দ্রথের বাড়ির উদ্দেশে। সেন্ট্রি-ব্যারাক থেকে হুড়মুড় করে বেরোচ্ছে দলে দলে ইউনিফর্মবিহীন সশস্ত্র প্রহরী। পাগল হয়ে খুঁজছে রানাকে সার্চ লাইটের আলো। এক ছুটে পুকুর ধারে চলে এল রানা। তারপর আরেক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠল কয়েকটা মেশিনগান এবং রাইফেল। আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিগুলো। সার্চ লাইটটা রানার ওপর এসে স্থির হয়ে গেছে। প্রথমেই গুলি করে সার্চ লাইট নিভিয়ে দিল রানা, তারপর শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে কোণাকুণি এগোল ইউক্যালিপ্টাস গাছের দিকে। হৈ-হৈ করে এগিয়ে আসছে একদল। আবার গুলি করল রানা। চিৎকার করে কয়েকজন পড়ে গেল মাটিতে, বাকি ক'জন শুয়ে পড়ল মাটিতে। বিশগুলির ম্যাগাজিন শেষ হয়ে গিয়েছে, ওটা ফেলে দিয়ে আরেকটা ম্যাগাজিন ভরল রানা। তারপর অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে প্রাণপণে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল সামনে। ঘাসবিহীন শুকনো মাটিতে ঘষা লেগে ছড়ে গেল দুই কনুই ও

হাঁটুর চামড়া। আরও লোক আসছে এগিয়ে। রানাকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা। ক্রমেই আরও অন্ধকারে সরে যাচ্ছে সে। কিন্তু পেছনে আলোকিত রাস্তা থাকায় রানা দেখতে পাচ্ছে প্রহরীদেরকে পরিষ্কার। আর একটু ডাইনে সরে গেল রানা। আরও বেশ খানিকটা দূরে আছে দেয়ালটা। গুলি এসে বিঁধছে আশেপাশে। খাবলা খাবলা মাটি লাফিয়ে উঠছে আধ হাত।

সাইরেন, গোলমাল ও গুলিগালাচের শব্দে হতচকিত হয়ে উত্তর-পূর্ব কোণের গার্ড পোস্ট থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। কয়েক পা এগিয়ে ধরাশায়ী হলো দু'জনেই নিজের পক্ষের সাব-মেশিনগানের গুলিতে। ব্যারাকের লোকগুলোও এতক্ষণে এসে যোগ দিয়েছে! 'ঠা-ঠা-ঠা-ঠা-ঠা' মেশিনগান চলছে—দুই হাত থর থর করে কাঁপছে, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে 'টাশ্' করে উঠেছে রাইফেলের গুলি। রীতিমত রণাঙ্গন হয়ে গেছে যেন এলাকাটা।

'হত্যা করতে হবে। যতগুলোকে পারা যায় হত্যা করতে হবে। খুন চেপে গেছে রানার মাথায়। আবার গর্জে উঠল রানার মেশিনগান। গরম হয়ে উঠল ব্যারেলটা। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ল কয়েকজন। এগিয়ে চলল রানা বুকে হেঁটে। পিছন পিছন মিলিটারি সেন্ট্রিরাও এগোচ্ছে বুকে হেঁটে। খালি ম্যাগাজিন ফেলে দিয়ে শেষ ম্যাগাজিনটা ভরে নিল রানা দুই সেকেণ্ড থেমে। দেয়ালের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে এবার রানা। মোটা গাছটার আড়ালে উঠে দাঁড়াল সে।

এমনি সময় 'বুম' করে একটা বোমা ফাটল আকাশে। আলোকিত হয়ে গেল চারদিক। জ্বলন্ত ম্যাগনেশিয়ামের তীব্র আলো ছোট্ট একখানা প্যারাস্যুটে ভর করে ধীরে নামছে নিচে। রাতকে দিন বানিয়ে দিল সেই আলো। পরিষ্কার দেখতে পেল রানা বেশ কাছেই দ্রুত বুকে হেঁটে জনা দশেক প্রহরী এগিয়ে আসছে রাইফেল হাতে। একটু হলে ধরে ফেলত রানাকে। নির্বিচারে গুলি চালাল রানা উঁচু থেকে। বড়শি বাধিয়ে ডাঙায় তোলা চিতল মাছের মত লাফাতে থাকল কয়েকজন। নরক হয়ে গেল জায়গাটা। রক্ত, ধোঁয়া, করডাইটের গন্ধ, আর সেই সঙ্গে যন্ত্রণা-কাতর আহত প্রহরীর ভয়াবহ চিৎকার।

অপর পক্ষ থেকেও কয়েকটা মেশিনগান ও রাইফেল গর্জে উঠল। অনেকগুলো এসে লাগল গাছে, বাকিগুলো গিয়ে বিঁধল দেয়ালে। আবার গুলি চালাল রানা। কয়েকটা বেরিয়েই শেষ হয়ে গেল গুলি। ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভেতরটা। আর রক্ষে নেই। টের পেলেই এগিয়ে আসবে ওরা নির্ভয়ে। কুকুরের মত গুলি করে মারবে ওকে। দেয়ালের দিকে চাইল রানা। কই, মিত্রা তো এল না! রশি ফেলবে বলেছিল। কোথায়? হয়তো আজ ঢুকতেই পারেনি ও। কিংবা হয়তো এসে পৌঁছোয়নি এখনও। আটটা কি বেজেছে?

আবার, না-ও তো আসতে পারে মিত্রা। রানার বন্দী হবার খবর যদি ওর কানে গিয়ে থাকে তাহলে হয়তো আসার প্রয়োজনই বোধ করেনি সে। শির শির করে একটা ভয়ের ঠাণ্ডা শিহরণ মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে এল রানার। আর রক্ষে নেই।

মিত্রার ওপর নির্ভর না করে সোজা গেটের দিকে যাওয়াই বোধহয় উচিত ছিল। এক্ষুণি ওরা টের পেয়ে যাবে রানার হাতে আর গুলি নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে

আসছে ওরা আর অবিরাম গুলিবর্ষণ করছে।

প্যারাস্যুটে চড়ে ম্যাগনেশিয়ামের আলো নেমে এসেছে অনেক নিচে। পুকুরের মধ্যে পড়েই দপ্ করে নিভে গেল আলোটা। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। গুলি বন্ধ করল সিপাইরা।

ঠিক এমনি সময়ে পেছনে 'সড়াৎ' করে একটা শব্দে চমকে উঠল রানা। মিত্রা না তো? লাফিয়ে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। ছুটে গিয়ে দেয়াল হাতড়াতে আরম্ভ করল ও পাগলের মত। সত্যিই, রশি এসে পড়েছে দেয়াল ডিঙিয়ে। দ্রুত উঠতে আরম্ভ করল রানা রশি বেয়ে।

মাঝ বরাবর উঠতেই 'বুম' করে আরেকটা শব্দ এল কানে। দিনের মত আলোকিত হয়ে গেল আবার চারদিক। দেখে ফেলেছে এবার ওরা রানাকে। হৈ হৈ করে এগিয়ে এল ওরা, কয়েকটা গুলি বিঁধল এসে আশেপাশের দেয়ালে। ছিটকে ইঁটের গুঁড়ো লাগল রানার চোখে মুখে। আবার কয়েক রাউণ্ড গুলি এল ছুটে।

ইউক্যালিপ্টাসের মিষ্টি গন্ধ এল নাকে। লাফিয়ে এদিকে পড়ল রানা দেয়াল থেকে। নামল বটে, কিন্তু নেমে আর উঠতে পারল না। অসম্ভব চোট লেগেছে পায়ে। ছুটে এসে ধরল ওকে মিত্রা। বহুকষ্টে টেনে নিয়ে গেল গাড়ির কাছে। পেছনের দরজা খুলে সাহায্য করল রানাকে ভেতরে ঢুকতে।

কোন মতে আছড়েপাছড়ে উঠল রানা সীটের ওপর।

'খানিকটা ব্র্যাণ্ডি দেব? সঙ্গে আছে।'

'শিগগির গাড়ি ছাড়ো, মিত্রা।' হাঁটুতে হাত বুলাচ্ছে রানা।

গাড়ি ছেড়ে দিল মিত্রা।

প্রহরী দু'জন অবাক হয়ে চেয়ে আছে এদিকে এত গুলি-গোলা, চিৎকার ও সাইরেনের আওয়াজ শুনে। ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার দেখে টের পেয়েছে ওরা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটছে ভেতরে। দূর থেকেই হাত তুলল ওরা। এই অবস্থায় গাড়ি ছেড়ে দিতে পারে না ওরা।

ড্যাশবোর্ড থেকে একটা পিস্তল বের করে রানার হাতে গুঁজে দিল মিত্রা। পয়েন্ট থ্রী-টু ক্যালিবারের 'রুপবীর' পিস্তল। ভারতের তৈরি।

লুটিয়ে পড়ল দুই প্রহরী কাঁকর বিছানো রাস্তার ওপর পেট চেপে ধরে। মিত্রা নেমে গিয়ে সাদা-কালো পেইন্ট করা পোস্টটা তুলে দিল। তারপর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটল হিন্দুস্তান অ্যামব্যাসাডার ফুল স্পীডে।

তেরো

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

রানার সুটকেস নিয়ে এসেছে মিত্রা গাড়িতে করে। কয়েক ঢোক ব্র্যাণ্ডি গিলে নিল রানা। কিছুটা মালিশ করল দুই হাঁটুতে। খিদেতে জ্বলছে পেট। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। কিছুটা চাঙ্গা বোধ করল ব্র্যাণ্ডির কল্যাণে। গাড়ি এখন বারাসতের পথে ছুটছে সত্তর মাইল স্পীডে। স্টিয়ারিং ধরে স্থির হয়ে বসে আছে মিত্রা সেন।

চলল ওরা বর্ডারের পথে। কিন্তু সেখানে পার হওয়া কঠিন হবে। যুদ্ধ বেধে গেছে দুই দেশে, এখন দুই দিকের সীমান্ত প্রহরীই সদা সতর্ক। ভারত থেকে যদি বহু কষ্টে বেরোতে পারে তবে মারা পড়বে গিয়ে ই. পি. আরের গুলি খেয়ে। কি করা যায়? প্ল্যান চলছে রানার মাথায় আশি মাইল স্পীডে।

তাছাড়া নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সবাইকে ইনফরম করা হয়ে গেছে। টিটাগড় থেকে কলকাতার দিকে গেলে এতক্ষণে ধরা পড়ে যেত। ব্যারাকপুর সামরিক ঘাঁটি পার হয়ে আসতে পেরেছে দেখে একটু নিশ্চিন্ত হলো রানা। বুদ্ধি বের করার সময় পাওয়া যাবে এখন। পথের মধ্যেই যে বাধা দেয়া হবে রানাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সহজে ছাড়া হবে না তাকে।

বারাসতে পৌঁছে বনগাঁ-যশোরের রাস্তায় না গিয়ে সোজা পুবে টাকির রাস্তায় চলল ওরা। যশোরের পথে দুই দেশের সীমান্ত প্রহরী অনেক বেশি তৎপর থাকবে। ওদিকে সুবিধে হবে না। তবে টাকি থেকে পাকিস্তানে ঢোকার তেমন কোন ভাল পথ জানা নেই রানার।

পঁচাত্তরের কোঠায় উঠল মাইল মিটারের কাঁটা। কিন্তু নিশ্চয়ই দ্রুততর কোন গাড়িতে অনুসরণ করবে ওরা। এ ছাড়াও বর্ডারের সৈন্যরা প্রস্তুত থাকবে রানার জন্যে। হঠাৎ মৃদু হাসল রানা। প্ল্যান এঁটে ফেলেছে সে।

এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে চারদিকে ভাল করে চাইল রানা। আকাশে কৃষ্ণা পঞ্চমীর ম্লান চাঁদ, ঘণ্টাখানেক হলো উঠেছে, পাশে সাদা মেঘের ভেলা। চারদিকে কেমন এক রহস্য। খুশি হয়ে উঠল ওর মন।

মিত্রার ঘড়িতে বাজে রাত ন'টা। আর দশ মাইল পরই বশিরহাট। এতক্ষণেও কোথাও বাধা পেল না দেখে একটু অবাকই হলো রানা। দুই হাঁটুতে অনেকক্ষণ মালিশের পর বেশ খানিকটা সুস্থ বোধ করল সে। সীট ডিঙিয়ে মিত্রার পাশে গিয়ে বসল। যাক্, শেষ হলো নাটক—ভারতনাট্যম।

জোর বাতাসে উড়ছে মিত্রার খোলা চুল। মুখের এক পাশে পড়েছে চাঁদের আলো। মৃদু হাসল মিত্রা। কেঁপে উঠল যেন সারাটা আকাশ। রানা ভাবল, যে দেখেছে এমন হাসি তার জীবন সার্থক। দু'পাশের মাঠে পাকা আউস ধান দুলছে মৃদু বাতাসে। পৃথিবীটাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রানার। ঠিক বোঝানো যায় না এই ভাল লাগাটাকে। বিচিত্র মানুষের জীবন। প্রতিপদে যার মৃত্যুর হাতছানি, সেই রানা জানে এই মায়াবী পৃথিবীর কি জাদু। বেঁচে থাকায় কত সুখ। হৃদয়টা উথলে উঠতে চাইল রানার এক অসীম কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু কার প্রতি কৃতজ্ঞতা? ঈশ্বর? প্রকৃতি? বুঝতে পারে না রানা। প্রকৃতির মায়া, বন্ধুর বন্ধন, সব মিলিয়ে তীব্র একটা ভাল লাগা—এজন্যে কার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে রানা?

আবোল তাবোল ভাবছে সে।

'জয়দ্রথ আমাদের সহজে ছাড়বে না, রানা,' মিত্রা বলল।

'জয়দ্রথকে শেষ করে এসেছি। কিন্তু ঠিকই বলেছ, টিটাগড়ের ব্যাপারটা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। সরাসরি ডিফেন্স মিনিস্টারের আওতারে। সহজে ছাড়বে না ওরা।'

'ভেতরে কি দেখলে?'

'পঙ্গপাল।'

রাস্তাটা বাঁয়ে ঘুরেছে। চাঁদটা চলে গেছে পেছনে। হঠাৎ এক সঙ্গে চমকে উঠল মিত্রা ও রানা। সামনের রাস্তায় ছায়া পড়েছে একটা। এক মুহূর্তে বুঝল রানা ব্যাপারটা। চাপা উত্তেজনায় টান হয়ে গেল ওর পেশীগুলো।

'ব্রেক করো! ব্রেক করো, মিত্রা!' চিৎকার করে উঠল রানা।

পনেরো-বিশ গজ স্কিড করে থামল গাড়ি। হেড লাইট অফ করে দিল মিত্রা।

'শিগগির বেরিয়ে পড়ো গাড়ি থেকে!' পিস্তলটা নিল রানা সঙ্গে। এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজা।

বেরোবার আগেই জ্বলে উঠল সার্চ লাইট। ওদের মাথার পঞ্চাশ গজ ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে একখানা হেলিকপ্টার। বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছে প্রকাণ্ড রোটর ব্লেড থেকে।

একলাফে বেরিয়ে মিত্রার হাত ধরল রানা। এই সম্ভাবনার কথা একবারও মাথায় আসেনি ওর। ছুটল ওরা মস্ত বটগাছটার দিকে। গজ পনেরো-বিশেক যেতেই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হলো পেছনে। সাঁ করে একটা তপ্ত লোহার টুকরো এসে ঢুকল রানার বাম বাহুতে। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। পড়ে যাচ্ছিল, মিত্রার কাঁধ ধরে সামলে নিল। অবশ হয়ে গেছে বাম হাতটা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে গাড়িটায়। সার্চ লাইটটা আবার খুঁজে বের করল ওদের। এক চোখ মেলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে যেন অগ্নিবর্ষণ করছে ওদের ওপর। এগিয়ে আসছে এবার ওদের দিকে।

আবার ছুটল ওরা। এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করল কো-পাইলট। কাঁধের কাছ থেকে এক খাবলা মাংস উড়ে গেল রানার। পড়ে গেল সে মাটিতে। আর অল্প বাকি আছে বটগাছ তলায় পৌঁছতে। বাঁচার তাগিদে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা এবার।

ঝিঁঝি ডাকছে চারপাশে। প্রকাণ্ড ডালপালা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে বটগাছটা। ওর তলায় কিছুটা নিরাপদ বোধ করল রানা। গাছের গায়ে বিঁধে যাচ্ছে কো-পাইলটের গুলিগুলো; কোন কোনটা আবার ডালে পিছলে 'বিঙ্ঙ্' শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে অন্যদিকে। টেনে তুলে রানাকে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসাল মিত্রা। গুলি খাওয়া হাত থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। কাঁধের জখম থেকে রক্ত ঝরে ভিজে গেছে রানার শার্ট। হাতটা বেঁধে দিল মিত্রা শাড়ি ছিঁড়ে। কিন্তু তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই কয়েক পরতা কাপড় ভেদ করে টপ্‌টপ্ করে রক্ত ঝরতে থাকল আবার। বড় অসহায় এবং দুর্বল মনে হলো রানার নিজেকে। সে কি করবে? একটা গোটা দেশের বিরুদ্ধে কি করবে সে একা?

গুলি চালানো বন্ধ হয়েছে। অনেক নিচে নেমে এসেছে পঙ্গপালের মত দেখতে কুৎসিত যন্ত্র দানবটা। হঠাৎ ছোট কি একটা জিনিস টুপ্ করে পড়ল কয়েক হাত দূরে।

'হ্যাণ্ড গ্রেনেড! মিত্রা! আড়ালে চলে যাও। কানে আঙুল দাও, জলদি!'

রানাও সরে এল বটগাছের প্রকাণ্ড গুঁড়ির আড়ালে। প্রচণ্ড শব্দে ফাটল হ্যাণ্ড গ্রেনেড। থেমে গেল ঝিঁঝি পোকার ডাক। পাতার খানিকটা ফাঁকা অংশ দিয়ে দেখা গেল খোলা ককপিটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কো-পাইলট। ধীরে ধীরে নামছে হেলিকপ্টার রাস্তার ওপর। গুলি করল রানা পর পর দু'বার। আবার পাতার আড়ালে চলে গেল হেলিকপ্টার। তিন সেকেণ্ড পরই ধপাস্ করে রাস্তার ওপর পড়ল কো-

পাইলটের লাশটা।

ধীরে ধীরে নেমে এল হেলিকপ্টার পিচ ঢালা রাস্তার ওপর। ওদের দেখতে পেয়ে হুইল এবং রোটর ব্রেক করে ককপিটের সামনে এসে দাঁড়াল পাইলট, হাতে মৃত কো-পাইলটের ব্রেন গান।

দুর্বলতায় হাত কাঁপছে রানার। পরপর চারটে গুলি করল সে পাইলটকে লক্ষ্য করে। কোন্ গুলিটা ল্যাগল বোঝা গেল না। বোধহয় শেষটা, কিংবা তার আগেরটা হবে। ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর মত বেঁকে গেল পাইলটের দেহ। ট্রিগারে হাত পড়ে গেল—লক্ষ্যহীন ভাবে আকাশের দিকে পনেরো-বিশবার অগ্নিবর্ষণ করে স্তব্ধ হয়ে গেল ব্রেন গান। লুটিয়ে পড়ল পাইলট হেলিকপ্টারের মেঝেতে। একটা পা বেরিয়ে থাকল ককপিট থেকে।

রক্ত! প্রচুর রক্তক্ষরণে অবশ হয়ে গেছে রানার দেহ। জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সে ধীরে ধীরে। শত্রু এলাকার মধ্যে জ্ঞান হারালে চলবে না। সমস্ত মনোবল একত্র করবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু বুঝল ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছে ওর স্নায়ুগুলো।

আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজনের হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে ওরা মশাল এবং লণ্ঠন হাতে করে। উপায় নেই। ধরা পড়ে যাচ্ছে ওরা। ছুটে গিয়ে গাড়ির ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে থেকে রানার সুটকেসটা টেনে বের করল মিত্রা। ডালাটায় আগুন জ্বলছে এখনও। ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বের করে নিয়ে দিশেহারার মত ছুটে এল মিত্রা রানার কাছে। লোকজন তখন বেশ কাছে চলে এসেছে। সময় নেই। যে করেই হোক রানাকে সজ্ঞান রাখতে হবে।

কয়েক ঢোক ব্র্যাণ্ডি খেয়ে উঠে বসল রানা। চারপাশের অবস্থাটা বুঝে নিয়ে বলল, 'আমাকে একটু ধরো, মিত্রা। হেলিকপ্টারের কাছে নিয়ে চলো।'

ককপিটের দরজা খোলা। কিন্তু সিঁড়ি নেই। রানার পক্ষে ওখানে ওঠা সম্ভব নয়। মিত্রা ভাবল, হেলিকপ্টারের ভিতরে যখন উঠতে চাইছে, তখন নিশ্চয়ই কোন গল্প বানিয়ে বলতে চায় রানা ওই গ্রামবাসীদের।

লাফিয়ে দু'হাতে ধরল মিত্রা ককপিটের নিচের অংশ। অনেক কসরত করে আঁচড়ে-খামচে উঠে পড়ল ভেতরে। ওপরে উঠে সিঁড়ি নামিয়ে দিল নিচে। ধীরে ধীরে উঠে এল রানা সিঁড়ি বেয়ে হেলিকপ্টারের ভিতর। মিত্রা সাহায্য করল ওকে হাত ধরে। পাইলটের পা ভাঁজ করে ভিতরে নিয়ে এল রানা।

'সিঁড়ি তুলে ফেলো।'

সিঁড়ি তুলে ফেলল মিত্রা। ককপিটের দরজাও বন্ধ করে দিল রানার হাতের ইশারায়। ড্রাইভিং সীটে বসে পড়ল রানা।

'আমার সীট বেল্টটা বেঁধে দাও তো, মিত্রা। তুমিও বসে পড়ো ওই সীটে।'

কথামত কাজ করল মিত্রা। তারপর অবাক হয়ে দেখল যন্ত্রপাতি নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করেছে রানা।

রাডার পেডালগুলো পা দিয়ে ছুঁয়ে দেখে নিল রানা, তারপর রোটর ব্রেকটা ছেড়ে দিয়ে পিচ কন্ট্রোলের থ্রটল্ একটু ঘোরাল। প্রকাণ্ড পাখাটা ঘুরতে আরম্ভ করল। প্রথম কয়েক পাক ভয়ানক লাগল প্রকাণ্ড রোটরের ছায়াটা দেখতে। ধীরে ধীরে রোটর স্পীড ইণ্ডিকেটারের কাঁটা উঠতে থাকল ওপরে। টেইল রোটরের

দিকে পিছন ফিরে একবার চাইল রানা। ইণ্ডিকেটারে যখন দেখা গেল স্পীড মিনিটে দু'শো পাক, তখন হুইল ব্রেক ছেড়ে দিয়ে আস্তে পিচ লিভারটা ওপরে টেনে থ্রটল্ ঘোরাল সে আরও খানিকটা। কেঁপে উঠল হেলিকপ্টার। উড়ি উড়ি করেও যেন প্রকাণ্ড পতঙ্গ সাকসিক্কটা মায়া কাটাতে পারছে না মাটির।

লণ্ঠন এবং মশাল হাতে নিয়ে বহু লোক জড়ো হয়ে গেছে রাস্তার দুই ধারে। ধুলো উড়ছে বলে নাকে কাপড় দিয়েছে বেশির ভাগ, কিন্তু স্পষ্ট উদ্বেগ দেখল রানা ওদের চোখে। রানা হাত নাড়ল ওদের দিকে। ওরাও ধন্য হয়ে গিয়ে হাত নাড়াতে থাকল।

আরও খানিকটা থ্রটল্ দিতেই প্রকাণ্ড পঙ্গপাল শূন্যে উঠে গেল। তিনশো গজ ওপরে উঠে নিচে চেয়ে দেখল রানা একবার। তখনও হাত নাড়াচ্ছে সরল গ্রামবাসী। কয়েকজন ঘিরে দাঁড়িয়েছে রাস্তায় পড়ে থাকা মৃত দেহটাকে, আর কিছু লোক চলে গেছে গাড়ির ধ্বংস স্তূপের কাছে।

দুই হাঁটুর মাঝখানে জয়-স্টিকটা ঠেলে দিল রানা সামনে, সেই সঙ্গে দিল লেফট রাডার।

'বর্ডার পেরোবে কি করে? অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট্ গান নিয়ে তৈরি হয়ে আছে দুই দিকের সীমান্ত প্রহরী।' মিত্রার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

'হিন্দুস্তান গার্ড কিছু বলবে না। এটা ভারতীয় এয়ারফোর্সের মার্কা মারা হেলিকপ্টার। আর পাকিস্তান গুলি ছোঁড়ার আগে নামবার আদেশ দেবে। ভদ্রলোকের মত নেমে পড়ব, ভয় কি?'

আরও কয়েক ঢোক ব্র্যাণ্ডি গিলে নিয়ে হেড ফোনটা কানে লাগিয়ে নিল রানা।

আর রানাকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বুনে চলল মিত্রা সেন।